নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

লেখকবৃন্দ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্যাণী কাজী কানন দেবী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরাশঙ্কর সেন দিলীপকুমার রায়
নলিনীকান্ত সরকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিশিকান্ত
পরিমল গোস্বামী প্রমথনাথ বিশী প্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীমতী বাণী রায় গোপাল ভৌমিক বিমল মিত্র
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মনোজ বসু শৈলজানন্দ
মুখোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
মন্মথনাথ ঘোষ

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

সম্পাদনা

'কথাসাহিত্য' সম্পাদক মণ্ডলী

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

৭ টেমার লেন,

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট,

কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

বিদ্রোহী প্রেমিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম

(জীবনী)

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন।"

[২৪ শ্রাবণ ১৩২৯ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কাজী নজরুল ইসলামকে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে যখন রবীন্দ্রনাথ এই বাণী পাঠিয়েছিলেন তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। এর কিছুদিন আগে থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-ফেরত সৈনিক কবি নজরুল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন অর্থাৎ অসি ছেড়ে মসী ধরেছেন। অবশ্য যখন তিনি সেনাদলে ছিলেন তখনো তাঁর লেখনী স্তব্ধ ছিল না। আবার শুধুমাত্র সাহিত্যে কীর্তিমান হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মসী ধারণ করেন নি। তাঁর শাণিত লেখনীতে যে উদ্দীপনার টঙ্কার-ঝঙ্কার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ত তা যে "আধ-মরাদের" ঘা মেরে বাঁচিয়ে তোলার সঞ্জীবনী মন্ত্র—সে প্রমাণ আজও আমরা পেয়ে থাকি। বস্তুতঃ, সম্প্রতি ভারত যখন যুদ্ধের কবলে পড়েছিল তখন নজরুলের গানই সবচেয়ে বেশি শোনা গিয়েছে। নজরুল বোধ করি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদনের মতো চিরকাল একটি বিরল-ব্যতিক্রম হিসাবেই রয়ে যাবেন। না, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান করতে চাচ্ছি না। আমার ধারণা, দুটি চরিত্রেই বিদ্রোহের নেশা, আর কল্পনার ব্যাপ্তি অসাধারণ। ব্যক্তি-

জীবনেও এঁরা ওই আবেগ আর স্বপ্নময় পরিমণ্ডলের প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। অবশ্য প্রতিভার নিয়মই হ'ল গতানুগতিক পথকে অনায়াসে অগ্রাহ্য ক'রে স্বকীয় শক্তির উৎসকে বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই কোনো প্রতিভাধরকে সাধারণ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে চাইলে ভুল ছাড়া বেশি কিছুই করা যায় না। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার পরিচয় মেলে একথা সত্য। তবে নজরুলের ব্যক্তিচরিত্রও বহুগুণসম্পন্ন নায়কের মতো আকর্ষণীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ সেই ব্যক্তিত্বেরই অনুসন্ধানের চেষ্টা মাত্র।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুন কাজী পরিবারে নজরুলের জন্ম হয়। তাঁদের বংশগৌরব পাণ্ডিত্যের জন্য, আর্থিক অবস্থা কিন্তু বিপরীত। নজরুলেরা খুব গরীব। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ধনী যাঁরা, দারিদ্র্যের ম্লানস্পর্শ বাঁচিয়ে চলাই তাঁরা পছন্দ করেন। এর উপর যদি গরীবের ছেলের আত্মসম্মানবোধের মত দামী উপসর্গ থাকে চরিত্রে তাহলে অপরের করুণা-কৃপা সে গ্রহণ করতে পারে না—তার ভাগ্যে কষ্ট কে খণ্ডাবে! নজরুলকে তাই লেখাপড়া শেখার জন্যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়েছে—সময়বিশেষে কিশোর নজরুলকে কখনো রুটির দোকানে, কখনো বা রেলের গার্ডসাহেবের বাড়িতে বাবুর্চি-খানসামার চাকরিও করতে হয়েছে। রুটির দোকানে এই সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান ছেলেটিকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে মৈমনসিংহ জেলার জনৈক পুলিস অফিসার নজরুলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান—উদ্দেশ্য ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা! এই কাজী রফীজুল্লাহ্ নজরুলকে দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেও, নজরুল সেখানে বেশিদিন থাকতে পারেন নি। তিনি মাথ্রুনে নবীনচন্দ্র ইন্স্টিটিউশনে এসে ভর্তি হলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী নিজের পৈতৃক গ্রামে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের খ্যাতি আছে। নিঃসম্বল নজরুল সম্ভবতঃ আর্থিক সুবিধা-সুযোগ পাওয়ার আশায়ই এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও মাত্র একটি বছরের বেশি তাঁর পড়া হয় নি। যদিও

পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত ভালো ফল করার জন্য তিনি ডবল প্রমোশন পেয়েছিলেন, তবুও না। বোধ হয় আর্থিক দুরবস্থাই তার কারণ। নিজের ভরণ-পোষণ আর শিক্ষার দায়িত্ব ছাড়াও বোধ হয় পরিবারকে অর্থ সাহায্যের প্রশ্নটা প্রকট হয়েছিল। অতএব তিনি শিয়ারসোলে চলে এলেন। রাজাদের এই স্কুলে নজরুলের এক আত্মীয় তখন পড়াশুনা করতেন। তাঁর কাছে ভরসা পেয়েই নজরুল শিয়ারসোলে গিয়ে ভর্তি হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ করা হ'ল। ব্যর্থমনোরথ নজরুল আত্মীয়টির উদ্দেশ্যে একখানি চিঠি লিখে রেখে তাঁর অনুপস্থিতিতেই শিয়ারসোল থেকে চলে যান। এই চিঠিখানিই শেষ পর্যন্ত নজরুলের নৈরাশ্যের কালো মেঘ ঘুচিয়ে দিল। নজরুলের অভিভূত আত্মীয়টি চিঠিখানি হেড্‌মাস্টার মশাইএর কাছে দাখিল করেন। মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথায়' লিখছেন: "এই পত্রের ভাষা ও মান নজরুল যে-ক্লাসে ভর্তি হতে এসেছিল সেই ক্লাসের ছাত্রদের তুলনায় উঁচু ছিল। তাই থেকেই নজরুল এতগুলি সুবিধাসহ শিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল।" (পৃঃ ৪১)

ছেলেবেলা থেকেই নজরুলের আচার-আচরণে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যার দরুন, যিনি একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তিনি শুধু যে আকৃষ্ট হয়েছেন তা-ই নয়, নজরুলকে তিনি কোনোদিন ভুলতেও পারেন নি। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম করা যায়। নজরুল যখন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তখন একদিন কুমুদরঞ্জন তাঁকে দেখবার জন্য পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুপুরবেলায় ৩২ কলেজ স্ট্রীটে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করেন। বোধ করি তাঁর মনে সংশয় ছিল ছেলেবেলার মাস্টার মশাইকে নজরুল হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবেন। অবশ্য কুমুদ-রঞ্জনের এই সংশয়কে মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে অপার আনন্দই দিয়েছিলেন নজরুল। পবিত্রবাবুর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে নজরুল খালি পায়েই ছুটে চলে এলেন ফুটপাতে এবং মাস্টার মশাইয়ের পায়ের

ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে সসম্মানে সমিতির অফিসে নিয়ে এলেন। গুরু-শিষ্যের এই মিলন উভয়েরই হৃদয়ের একটি সুন্দর দিক উদ্ঘাটিত করে। আলাপ-আলোচনার মধ্যে একসময়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নজরুল বল্লেন—"সার, আমিও আপনার মতো পাগল!" তাঁর এ কথায় কুমুদরঞ্জনের দু'চোখে স্নেহ ও বাৎসল্যের কোমল মাধুর্য ঝরেছিল।

শিয়ারসোল রাজ স্কুলে পড়বার সময়ই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মশাইএর সঙ্গে নজরুলের দোস্তী হয়। স্বভাবসুলভ নৈপুণ্যের সঙ্গে যদি নির্ভেজাল দরদের সঙ্গত ঘটে তাহলে অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও জাদুমন্ত্রে পাঠককে সম্মোহিত ক'রে রাখে। শৈলজানন্দের "আমার বন্ধু নজরুল" সেই অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি। এহ বাহ্য—আগে হ'ল সেই স্মরণীয় কৈশোরোপান্তিক স্বপ্নিল বন্ধুত্বের মায়াকাজল।

কাছাকাছি স্কুলের দুটি ছাত্র। আর্থিক অবস্থার বৈষম্য আর ধর্মের ভিন্নতার বেড়া ডিঙিয়ে কবে, কেমন ক'রে কাছাকাছি এসে পড়েছিল তা আজ আর কারুরই মনে নেই। না থাক, যোগসূত্রটা যে পাকাপোক্ত, এটাই বড় কথা। স্কুলের ছুটির পরই বড়লোকের দৌহিত্র শৈলজা বাড়িতে বইখাতা রেখে ছুট দিত 'মোহমেডান্ বোর্ডিং'-এ দুখু মিঞার কাছে। দাদামশাইয়ের বাড়ির আদরের জলখাবার থাকতো পড়ে, ওদিকে বোর্ডিং-এ গিয়ে বিস্কুটওয়ালার ঝাল-রুটির ওপরেই শৈলজার যত লোভ। মাঠে-ঘাটে-বাগানে-হাটে বেড়ানো আর নানারকম খোশ-খেয়ালের মধ্যে দিন কেটে যায়। এখানেই উভয়ের সাহিত্যচর্চার উন্মেষ ঘটে। গোড়াতে নজরুল লিখতেন গল্প আর শৈলজানন্দ কবিতা! অকস্মাৎ একটি কবিতা লিখে নজরুল বন্ধুকে চমকে দিলেন। শৈলজা বুঝলেন কবিতাই নজরুলের ভাবের মুক্তির আসল পথ। তিনি বললেন, 'তুমি আর গল্প লিখো না।' তথাস্তু। নজরুল কবিতাই লিখতে শুরু করলেন। প্রথম কবিতা 'রাজার গড়'। তারপরই লেখা হ'ল 'রাণীর গড়'। সে আমলে পাঠ্যতালিকার বাইরে কোনো গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়াও ছাত্রদের চারিত্রিক অবধারিত অবনতি ব'লে গণ্য হ'ত—আর লেখা ত রীতিমত

অপরাধ! অতএব নজরুলের লেখার পাঠক ছিলেন শৈলজা এবং শৈলজার নজরুল।

মোট কথা নজরুলের প্রথম কবিতা দুটি জহুরীর হাতে পড়েছিল তাই ১৯১৭তে রচিত এবং কোনো পত্র-পত্রিকায় অপ্রকাশিত হয়েও আশ্চর্য ভাবে রক্ষা পেয়েছে। শিয়ারসোলের স্কুলে পড়বার সময়ে নজরুল ছোট একটি চড়ুই-ছানাকে নিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তাও শৈলজানন্দ তাঁর 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। চড়ুই-ছানাকে কেন্দ্র ক'রে কবিতাটি লেখার আগের দিনও কিন্তু দুখু মিঞা এয়ার-গান হাতে নিয়ে বাগানে-বাগানে বড়লাট, ছোটলাট, আর ইংরেজ সরকারের আমলাদের গুলীবিদ্ধ ক'রে হত্যার নেশায় ঘুরে বেড়িয়েছে। গাছের এক-একটি ফলককে ইচ্ছেমত 'লাট-বেলাট' কল্পনা ক'রে গুলী ছুঁড়ে মেরে মেরে ইংরেজ নিধন ক'রে বেড়াতো দুখু মিঞা। হঠাৎ কোথা থেকে কী ঘটে গেল, সে স্কুলেও গেল না! না, তাকে কবিতায় পেয়েছে। বাসা থেকে পড়ে যাওয়া একটি চড়ুই-এর ছা'কে আবার কেমন ক'রে বাসায় তুলে তার মায়ের কাছে পুনর্বাসিত করা হ'ল—এই হ'ল বিষয়বস্তু। কবিতার শেষ ক'টি পংক্তিতে ভবিষ্যৎ কবিখ্যাতির বীজ লক্ষণীয়:—

"পাখীর মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি দিল ঢেলে।
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!"

যে হাতে বন্দুকের গুলী নির্ভুল ভাবে লক্ষ্যবস্তুকে ঘায়েল করেছে সেই হাত দিয়েই এই কোমল হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটেছে!

এই হ'ল নজরুলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—যা কৈশোরেও সোচ্চার হয়ে ফুটে উঠছিল। একদিকে বিদেশী সরকারের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ আর তারই পাশাপাশি অসহায় তুচ্ছ পাখীর ছানাটির প্রতিও অকৃত্রিম দরদ!

অলৌকিকতার উপরও তাঁর কৌতূহল কিছু কম ছিল না। শিয়ারসোলে এক গাঁজা-খোর সন্ন্যাসীর কাছে নজরুল কয়েকদিন গিয়েছিলেন—প্রণামী হিসেবে রোজ দু-আনার গাঁজা নিয়ে হাজির হ'তে হ'ত। রাজাজীর এস্টেট থেকে এই দরিদ্র ছাত্রটির স্কুলের

মাইনে, বোর্ডিং-এ থাকা খাওয়ার খরচ ত বহন করা হতই, তা ছাড়া মাসে সাত টাকা ক'রে জলপানিও নজরুল পেতেন। প্রতি মাসেই নজরুলের ভাই আসতেন এবং বাড়ির জন্য টাকা নিয়ে যেতেন। অতএব অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থা না থাকলে এই অবস্থায় কেউ ওইভাবে পয়সা খরচ করতে পারে না।

শিয়ারসোলের স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই কিন্তু নজরুল আপন খেয়ালে যাত্রাদলের পালা এবং গান রচনা করতে পারতেন এবং করতেনও। তিনি যে গার্ড সাহেবের বাড়িতে চাকরি করতেন সেই গার্ড সাহেব কতকটা জোর করেই যাত্রাদলের আসর থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাত্রাদলের অধিকারী বাসুদেব যখন দেখল সাহেবটি দুখুকে শক্ত মুঠোয় ধরেছে তখন কাকুতি-মিনতি ক'রেছিল: "...ও শুধু গান লেখে, পালা লেখে আর সুর দিয়ে দেয়। যা বলতে হয় আমাকে বলুন।"

তবে যাত্রাদলের সেই সব পালা আর গানের কোনো হদিস আজ পাওয়া সম্ভব নয়। নজরুল যখন পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তখনকারও একাধিক রচনা হারিয়ে গেছে। আসলে মানুষটি চিরকালই যেমন বেপরোয়া তেমনি অগোছাল।

স্কুলের ধরা-বাঁধা লেখাপড়ার মধ্যে নজরুলের মন আর বসে না। গান গেয়ে, কবিতা লিখে, আড্ডা দিয়ে, ইংরেজী বলতে শেখার আশায় দিশি-সাহেবদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজে ঘুরে বেড়িয়েও তাঁর পরীক্ষার ফল খারাপ হয় না। যুদ্ধের জন্য ইংরেজ সরকার লোক চাইছে। রাণীগঞ্জ শহরের দেয়াল আর গাছের গুঁড়ি রং-বেরং-এর প্রচারপত্রে ছেয়ে গেছে। শিয়ারসোল স্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের দ্বারাই নজরুল দেশাত্মবোধের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই সময়ে দেশের নেতারাও যুবকদের যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। নজরুলের মাথায় ঢুকল সেনাদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যাটা শিখে নিয়ে, ইংরেজের শেখানো বিদ্যাই ইংরেজের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। তিনি স্থির করে ফেললেন নিজের ভবিষ্যৎ এবং শৈলজাকেও বললেন—'চলো।'

শৈলজার উভয় সংকট—সামনে পরীক্ষা, আর বন্ধুর আহ্বান। অবশেষে তিনি বন্ধুকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, পরীক্ষাটা দিয়ে তারপর পল্টনে নাম লেখাতে যাওয়াই ভালো। কিন্তু নজরুলকে পরীক্ষার কথা বলতে, তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। যুদ্ধে যাওয়া যখন স্থির তখন আর স্কুলের ছায়াও তিনি মাড়াতে নারাজ। তবে শৈলজার জন্য তিনি দিনকয়েক অপেক্ষা করলেন। তারপর বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে যোগ দেবার জন্য কলকাতায় এলেন দু'জনে একসঙ্গে। তার আগে অবশ্য আসানসোলে গিয়ে এস-ডি-ও-র চিঠি নিতে হয়েছিল। যাই হোক, ধনী আত্মীয়ের কী এক কৌশলে শৈলজার যুদ্ধে যাওয়া হ'ল না। নজরুল বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে যোগ দিয়ে নওশেরা যাত্রা করলেন।

॥ দুই ॥

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জনৈক হাবিলদার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ডাকে একটি কবিতা পাঠালেন। নতুন কবির রচনা, তায় আয়তনেও বেশ বড় — সাধারণতঃ এসব কবিতা ছোট হরফে, 'কোরক' নামাঙ্কিত বিভাগেই ছাপা হয়ে থাকে। 'কোরক' মানেই কাঁচা লেখার বিভাগ। নামে যদিও পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শহীদুল্লাহ্ সাহেব এবং মোজাম্মেল হক সাহেব, সহকারী সম্পাদক মুজাফ্‌ফর আহমদ্ ছিলেন পত্রিকার প্রাণধারক। নজরুলের কবিতায় তিনি বাংলাসাহিত্যে একজন শক্তিমানের দৃঢ় পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব কবিতার 'ক্ষমা' নামটি বদলে 'মুক্তি' দিয়ে সেটি পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। ছাপা হওয়ার পর কবি যে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন তা অকুণ্ঠ ভাষায় চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন এবং আরও লেখা সেই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। এবার গল্প—'হেনা'। ১৯১৯-এর শ্রাবণ এবং কার্তিকে অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটি লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেল।

পল্টনে থাকবার সময়েই তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প এবং কবিতা

লিখে পাঠাতে থাকেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা এবং প্রবাসী, সওগাতে তা প্রকাশও হয়েছিল। সেই সময়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও তাঁর চিন্তা শুরু হয়। সে-কথা তিনি মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবকে যে চিঠিপত্র লেখেন তাতে প্রতিফলিত দেখা যায়। একবার সাত দিনের ছুটিতে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন শৈলজানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্‌ফর আহমদের কাছে গিয়েছিলেন। চিঠিপত্রের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তা চাক্ষুষ সাক্ষাতে নিবিড়তর হ'ল। এদিকে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট যে ভেঙে দেওয়া হতে আর দেরি নেই সে-কথাও তিনি প্রকাশ করলেন। তারপর ভবিষ্যতে কি করবেন নজরুল? শৈলজানন্দকে তিনি আগেই চাকরির খোঁজ করতে বলেছিলেন। চাকরি সহজলভ্য নয়। তা ছাড়া নজরুলের বিরাট সাহিত্য সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধব সকলেই আশা করেছিলেন যে, লেখা-লিখির দিকে থাকলেই ভালো হবে।

মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের চোখ দিয়ে আমরা একুশ বছর বয়সের নজরুলকে এক নজর দেখার সুযোগ নিতে পারি। "সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা হাসি। তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে যে-কোনো লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না।"

পল্টনে নিযুক্ত অবস্থায়ই নজরুলের লেখার মধ্যে দেশ-প্রেম প্রতিফলিত হয়েছিল, সে দেশপ্রেম শুধু শৃঙ্খলিত ভারতের প্রতি বেদনা-মমতায় সিক্ত ছিল না, তাতে নিপীড়িত দরিদ্র বিরাট মানবগোষ্ঠীর প্রতি দরদসিক্ত ছিল। 'ব্যথার দান' গল্পে তিনি নাকি স্পষ্টাক্ষরে 'লাল-ফৌজ'-এর উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব আইন ও শৃঙ্খলার নিরাপত্তার কথা চিন্তা ক'রেই নায়ককে 'লাল-ফৌজ'-এর বদলে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদল'-এ যোগ দিইয়ে ছেড়ে দিলেন। আহমদ সাহেব গল্পের লেখককে জিজ্ঞাসা না ক'রেই পাণ্ডুলিপিতে এই পরিবর্তন করেছিলেন। নজরুলের জীবনীকারদের মধ্যে এ নিয়ে

যে বাদানুবাদ হয়েছে তার মধ্যে না গিয়েও এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, তাঁর 'ব্যথার দান' এবং 'হেনা' গল্পের মধ্যে, আন্তর্জাতিকতার প্রতি সচেতন অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯২০-এর মার্চ মাসে নজরুল সেনাদলের থেকে পুরোপুরি ভাবে মুক্ত হয়ে বেকার অবস্থায় কলকাতায় এসে প্রথমে বন্ধু শৈলজানন্দের বোর্ডিং-এ বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি নিয়ে আস্তানা গাড়লেন। যা-হোক একটা কিছু করতে হবে। দিন তিন-চার গান, গল্প আর জল্পনা-কল্পনায় কাটলো। কিন্তু তারপরই ফ্যাসাদ হ'ল, বোর্ডিং-এর চাকর মুসলমানের এঁটো বাসন ধুতে নারাজ। নজরুলকে লুকিয়ে শৈলজা নিজেই বন্ধুর এঁটো থালাবাসন মাজলেন। কিন্তু দুখু মিঞা ঠিক টের পেয়ে গেছে। অতএব সে আর বোর্ডিং-এ থাকতে রাজী নয়। নজরুলের যে কথা সেই কাজ। তাছাড়া মাস কয়েক আগে যখন ছুটিতে এসেছিলেন তখন ত মুজফ্‌ফর ব'লেই দিয়েছিলেন মুসলমান সাহিত্য সমিতির একখানা খালি ঘরে নজরুলের থাকার ব্যবস্থা হবে। শৈলজানন্দ একদিনের সাক্ষাতেই মুজফ্‌ফরের আন্তরিকতার প্রকাশ দেখেছিলেন। কাজেই বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে তিনি কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্‌ফরেব ডেরায় হাজির হলেন। আহমদ সাহেবের ঘরে আর একখানা তখ্‌তপোশ পড়ল—নজরুল আর তিনি এক ঘরের বাসিন্দা হলেন। নজরুল যেদিন এলেন সেই রাত্রেই গানের আসর বসল জাঁকিয়ে। আসর বসেছিল আফজালুল হক সাহেবের ঘরে। সেখানেই নজরুলের 'মোসলেম ভারত'-এ লেখার কথা হয়ে গেল। 'মোসলেম ভারত' তখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। কথা হ'ল করাচীতে নজরুল 'বাঁধন হারা' নামে যে পত্রোপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন সেটা ওই পত্রিকায় ছাপা হবে।

এর দু-দিন পরে নজরুল চুরুলিয়ায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখান থেকে সাত-আট দিন পরে কলকাতায় ফিরলেন। সেবারে মায়ের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে মনান্তর ঘটেছিল ব'লে নজরুল সজ্ঞানে আর কখনো চুরুলিয়ায় যান নি। চুরুলিয়া থেকে কলকাতার পথে তিনি বর্ধমানে নেমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে

সাব-রেজিস্ট্রার পদের প্রার্থী হিসেবে একটি দরখাস্ত দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ৩২ কলেজ স্ট্রীটের ঠিকানায় যখন আবেদনের উত্তরে ইণ্টারভিউ-এর চিঠি এল তখন মুজফ্‌ফর আহমদ, আফজালুল হক প্রমুখ বন্ধুরা মিলে কবিকে ওই চাকরিতে যোগ না দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাঁরা বোঝালেন যে ওই চাকরি নিলে, কোন্ অজ-পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হবে, তাতে নজরুলের সাহিত্য-জীবন একেবারে বরবাদ হবে। এই সময়ে নজরুলের বিশেষ অনুরাগী মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব নজরুলের কলকাতায় আসার খবর পেয়ে বীরভূম থেকে কিছু টাকা সাহায্য হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হুসয়ন সাহেব ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন, এ অবস্থায় নজরুলের টাকার প্রয়োজন হবে। এই মঈনুদ্দীন এবং মুজফ্‌ফরের আতিশয্যে নজরুল কিছুদিনের মধ্যেই হাফিজ-এর 'দিওয়ান'-এর বাংলা তর্জমা করেন। নজরুল নিঃসন্দেহে হাফিজ-এর অনুরাগী ছিলেন, নইলে তিনি পল্টন থেকে যখন ফেরেন তখন রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির সঙ্গে মহাকবি হাফেজের মূল ফার্সীর সঙ্গে উর্দু তর্জমা সম্বলিত 'দিওয়ান'-এর একটি বড় সংস্করণের বই থাকবে কেন!

নজরুল যেখানে যখন থাকতেন সে-জায়গা তখন মাতিয়ে রাখতেন গানে, গল্পে, হাসিতে। কাজেই ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট-এর আড্ডা তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে বিশেষ আকর্ষণের স্থান হয়ে উঠল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতার মানুষের যে প্রাণপ্রাচুর্য ছিল আজকের যুবসমাজ তা কল্পনাও করতে পারবেন না। সাহিত্যের আড্ডায় রাজনীতির আলোচনা থেকে শুরু ক'রে আবৃত্তি, গান কিছুই বাদ যেত না।

যা-ই হোক, ১৯২০-তে নজরুলের সাহিত্যজীবন পুরোপুরি ভাবে শুরু হ'ল। তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'সওগাত', 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী,' 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতে থাকলেন। বলা বাহুল্য যে, শক্তিমান কবি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রটতে বিশেষ সময়ও লাগে নি।

ইতিপূর্বে যাঁদের কথনও সমিতির অফিসে দেখা যায় নি তাঁরা

অনেকেই এসে জমতে লাগলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কবি কান্তি ঘোষ, ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার মশাইও আসতেন। এছাড়া নজরুলের পল্টনের বন্ধুরা ত ছিলেনই। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজা-নন্দ ত আসবেনই—ওঁরা ছিলেন নজরুলের অন্তরঙ্গ দোস্ত। এখান ওখান থেকে নজরুলের ডাক আসতে লাগল গান গাইবার জন্য। সব রকমের গানই তিনি গাইতেন তবে মূলতঃ তিনি রবীন্দ্রনাথের গানই বেশি গাইতেন।

অল্পদিনের মধ্যে তরুণ নজরুল নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠা পেলেন—এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

'মোসলেম ভারত' এবং মোসলেম পাবলিশিং হাউস-এর পরিচালক আফজাল সাহেব বোধ করি নজরুলের জনপ্রিয়তা এবং প্রতিভার প্রতিশ্রুতি দেখে মনে মনে লুব্ধ হয়েই কবিকে পাকাপাকি ভাবে নিজের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম বছরে ওই পত্রিকায় তাঁর মোট তেরটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'খেয়াপারের তরণী' এবং 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা দুটি পড়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদকের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাষায় পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি অকুণ্ঠভাবে লেখেন: "....বহু দিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ।....

নজরুল কবি, নজরুল বিদ্রোহী। তিনি সাহিত্যের আসরে শখ মেটাতে আসেন নি। এসেছিলেন প্রাণের তাগিদে। কাজেই তাঁর লেখনী কাব্য-কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ফজলুল হক সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং কাজী নজরুল ইস্‌লামের যুগ্ম-সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হ'ল।

'মুসলমানের ছেলেরা হয়তো ভালো বাংলা লিখতে পারবে না' ফজলুল হক সাহেবের এই আশঙ্কাকে একেবারে বরবাদ ক'রে দিয়ে 'নবযুগ' প্রথম দিনই জনপ্রিয়তার দ্বারা অভিনন্দিত হ'ল। নজরুলের 'জোরালো' কলমের দৌলতেই কাগজ আর একটিও পড়ে রইল না। কাগজের চাহিদা দিন দিনই বেড়ে চলেছিল, কিন্তু 'নবযুগ'-এর ছাপাখানার এমন শক্তি ছিল না যে চাহিদার যোগান দিতে পারে।

কলেজ স্ট্রীটের বাস তুলে দিয়ে তাঁরা দু'জনে টার্ণার স্ট্রীটে বস্তির মধ্যে একখানি ছোট্ট পাকাবাড়িতে এসে উঠলেন। এখান থেকে 'নবযুগ'-এর অফিস দু-এক মিনিটের পথ। এই কালে সাহিত্যিক আড্ডায় নজরুলের যাতায়াত বন্ধ না হলেও সময় সীমিত হয়েছিল। আড্ডা দিতে দিতে অকস্মাৎ তিনি আবৃত্তি ক'রে উঠতেন :

'ওঠ কবি সৈনিক, নবযুগ দৈনিক।'

এবং পরক্ষণেই নিজেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে বেরিয়ে আসতেন। খবরের কাগজে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না, কিন্তু প্রখর বুদ্ধি দিয়ে তিনি সংবাদের যে সার বস্তুটি অল্প পরিসরে ফুটিয়ে তুলতেন তা ঝানু সাংবাদিককেও হার মানাতো। এর মধ্যে সাহিত্যিক কুশলতাও বিচ্ছুরিত হ'ত। আবেগময় ভাষা দিয়ে তিনি দেশের সমসাময়িক আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরতেন। সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বভাবতঃই নবযুগের ওপর পড়েছিল। নজরুলের 'গরম' লেখাই এর কারণ। পর পর তিনবার সতর্ক করা সত্ত্বেও পত্রিকার সুর নরম হয় নি। তার ফলেই সামান্য অছিলা দেখিয়ে নবযুগের টাকা বাজেয়াপ্ত ক'রে সরকার দু'হাজার টাকা জমা দেবার নির্দেশ জারি করেন। 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত লেখাগুলি ১৯২২-এ 'যুগবাণী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময়ে তিনি 'ধর্মঘট' নামক যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে বিশ্বের চাষী ও মজুর শ্রেণীর অমানুষিক দশার মর্মস্পর্শী চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি স্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎবাণী করছেন : "এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেন না ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত

হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এদেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবীদলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডেমোক্রেসির জাগরণও এদেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রুখিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।"

জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দফা টাকা জমা দেবার ব্যাপারে ফজলুল হক সাহেব একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। পরিশেষে তিনি অন্যের কাছ থেকে যোগাড় ক'রে টাকা জমা দিলেন বটে, তবে আগের মতো সর্বময় কর্তৃত্ব আর মুজফ্‌ফর এবং নজরুলের হাতে রইল না। নজরুল বা মুজফ্‌ফর চাকরি ক'রে দুটো পয়সার মুখ দেখবার আশায় 'নবযুগ'-এর পেছনে মেহনত করতে আসেন নি—তাঁরা এসেছিলেন রাজনৈতিক আদর্শকে প্রাণরূপ দেবার তাগিদে। কাজেই নতুন ব্যবস্থায় দুজনের কেউ খুশী হতে পারলেন না।

তাঁরা 'নবযুগ' ছেড়ে চলে যাবাব কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। তবে তার আগে হক সাহেবকে জানিয়ে যাবেন এও ঠিক করেছিলেন। এদিকে নজরুলের সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুরা কবিকে একটা খবরের কাগজের খর্পরে পড়ে আখের খোয়াবে—এটা পছন্দ করছিলেন না। তাঁরা সুযোগ পেলেই 'নবযুগ' ছেড়ে দেবার জন্য নজরুলকে খোঁচাতেন। সত্যিসত্যিই তাঁদের অভিপ্রায় অগ্রাধিকার পেল। এবং মুজফ্‌ফব আহ্‌মদ সাহেবের জবানবন্দীতে দেখা যাচ্ছে যে, আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের একটা মৌখিক চুক্তি হয়েছিল—নজরুল 'মোসলেম ভারত' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকায় লিখবেন না, এবং আফজাল তাঁকে প্রতি মাসে একশত টাকা দিয়ে যাবেন। 'নবযুগ' ছেড়ে দেবার পর নজরুল আর কলকাতায় রইলেন না। তিনি দেওঘরে হাওয়া বদলের জন্য চলে গেলেন। নিরিবিলিতে বসে তিনি অনেক বেশি লিখতে পারবেন এই রকম একটা ভরসা প্রত্যাশা সকলেই

করেছিলেন। কিন্তু নির্জনে, নিরুপদ্রব পরিবেশে কাব্যের বা কাহিনীর ফসল তেমন ফলে নি—মোট তিন-চারটি কবিতা! সে যা-ই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে নজরুলের চিঠি এল, তাঁর হাত শূন্য আফজাল যেন অবিলম্বে টাকা পাঠিয়ে দ্যান। আফজালের সঙ্গে আরও একজনের নাম সে চিঠিতে ছিল—আলী আকবর খান! বোধ হয় এঁরা দুজনেই নজরুলকে হাওয়া বদলের জন্য পাঠিয়েছিলেন—আর্থিক ভরসা দিয়েই পাঠিয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই।

এ তরফ থেকে টাকা যায় নি, গিয়েছিল লেখার তাগিদ। টেলিগ্রাম ক'রে লেখা তলব করা হয়েছিল। এইসব দেখে মুজফ্ফর মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। শেষে আর থাকতে না পেরে তিনি আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে দেওঘরে চলে গেলেন। ইচ্ছে, ক'দিন পশ্চিমে বেড়ানোও হবে, অমনি নজরুলকেও দেখে আসা হবে। সেখানে পা দিয়েই বন্ধুর অবস্থা বুঝে নিলেন তিনি। এবং এরপর নজরুলকে সঙ্গে নিয়েই মুজফ্ফর কলকাতায় ফিরলেন।

কলকাতায় ফেরার পরদিনই আফজাল সাহেব গিয়ে নজরুলকে নিজের আস্তানায় নিয়ে চলে এলেন। সবচেয়ে মজার কথা, যে খবরের কাগজে লেখার বিরুদ্ধে একদিন নজরুলের বন্ধুরা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, তাঁদের আস্তানায় আশ্রয় নেবার কিছুদিনের মধ্যেই সেই হাত-ফেরতা 'নবযুগে' লেখার কাজ নিতে হয়েছিল। এবার কিন্তু তাঁরা কেউ বাধা দেন নি। বোধ করি আর্থিক দিকটাই এতদিন পরে তাঁদের চোখে বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এবারও নজরুল 'নবযুগে' অল্পদিনই টিকতে পেরেছিলেন। কারণ সেই 'গরম' লেখা তিনি ছাড়তে পারেন নি। তার চেয়ে চাকরি ছাড়াটাই তাঁর পক্ষে সহজ।

॥ তিন ॥

দ্বিতীয় বার 'নবযুগ' ছাড়বার পর নজরুল আর এক বন্ধুর অনুরোধে কুমিল্লায় চলে গেলেন। এই বন্ধুটি হলেন আলী আকবর

খান—যাঁকে 'লিচু চোর' কবিতাটি নজরুল লিখে দিয়েছিলেন। আলী আকবর খুব সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আর নজরুলের প্রকৃতিতে কুটিলতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি যেমন অকুণ্ঠ দরাজ কণ্ঠে হাসতে পারতেন তেমনি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তাঁর চওড়া বুকের কপাট ছিল অবারিত। আলী আকবর আদর ক'রে নিজের দেশের বাড়িতে নজরুলকে নিয়ে যেতে চাইলেন। নজরুলও সরল বিশ্বাসেই ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিলেন। আলী আকবরের বাড়ির পথে তাঁরা দুজনে কুমিল্লা শহরে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে উঠলেন। এই পরিবারটির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হলেও রাজনীতি, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের আবহাওয়ায় পুরোদস্তুর প্রগতিশীল পরিবার। কাজেই নজরুলের মতো উদীয়মান কবির আগমনবার্তা অল্পক্ষণের মধ্যে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর উৎসাহী যুবকবৃন্দের পাল্লায় পড়ে চার-পাঁচটা দিন গানে, গল্পে, আবৃত্তি আর বৈঠকে কুমিল্লা শহরেই তাঁদের কেটে গেল। নজরুল ত বাড়িরই একজন হয়ে পড়লেন। বাড়ির গৃহিণী বিজয়াসুন্দরী দেবীকে তিনি মা বলে ডাকলেন এবং ইন্দ্রকুমারের বিধবা বৌদিকে মাসীমা বলতে শুরু করলেন। আসলে ইন্দ্রকুমারের পুত্র বীরেন্দ্র ছিলেন আলী আকবরের স্কুলের সহপাঠী—সেই সময়েই এই আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। নজরুল এই রকম একটি পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে মুগ্ধ হলেন। সত্যি কথা বলতে, জীবনের শুরু থেকে তাঁকে কেবলই লড়াই ক'রে আসতে হয়েছে। আর পল্টন থেকে ফিরে, নিজের বাড়িতে গিয়েও তাঁর তৃষিত হৃদয় বেদনা আর যন্ত্রণা বাড়িয়ে নিয়েই ফিরেছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্পূর্ণ অচেনা একটি সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে আপন-করার সেই বাঞ্ছিত সুরটি বেজে উঠতে তিনি তাই নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। নজরুলের সঙ্গে গিরিবালার কন্যা প্রমীলার সঙ্গে এইখানেই আলাপ হ'ল। প্রমীলা এবং তাঁর খুড়তুতো বোন কমলা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে সবে স্কুলের লেখাপড়া ছেড়েছেন। নজরুল এখানেই যেন মা, ভাই, বোন সবই পেয়ে গেলেন।

আলী আকবর কিন্তু নজরুলকে নিছক আপন দেশ দেখাবার

উদ্দেশ্যে নিয়ে যান নি। তাঁর নিজেরও লিখে নাম কেনার শখ ছিল, আর বই প্রকাশের ব্যবসা ক'রে আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে ফেলার মতলবও ছিল। প্রকাশন ব্যবসায়ে পয়সা করার পক্ষে নজরুলের বই সোনার ডিম পাড়বে এটা আলী আকবর বুঝে ফেলেছিলেন। তাই কবিকে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পূর্ববঙ্গে রাখার জন্য খান সাহেবের বেড়াজাল ফেলা। তিনি নজরুলের চরিত্রের দুর্বল দিকটি আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাবার জন্য নিজের এক ভাগিনেয়ীর সঙ্গে নজরুলের বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন। নজরুলকে বোঝানো হয়েছিল, মেয়েটি তাঁর প্রেমে পড়েছে! উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকল। মেয়েটির সৈয়দা খাতুন নামের বদলে নজরুল তাঁকে নার্গিস সম্বোধন করলেন। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিপত্র বিভিন্ন জায়গায় চলে গেল। আমন্ত্রিত হয়ে বিজয়াসুন্দরী দেবী এবং সেনগুপ্ত পরিবারেব ছেলেমেয়েরা সকলেই গিয়েছিলেন—এটা নজরুলের অনুরোধেই ঘটেছিল। কিন্তু বিয়ের আসর ছেড়ে বর উঠে পড়লেন! কেন? মুসলীম বিবাহ পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের চুক্তিপত্র হয়। এই চুক্তিপত্রে একটি শর্ত ছিল—নজরুল তাঁর স্ত্রীকে কোনোদিনই নিজের ইচ্ছামত নিয়ে যেতে পারবেন না, তবে তিনি শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে অবশ্যই পারবেন। বাংলায় যাকে বলে ঘর-জামাই, বোধ করি নজরুলকে তা-ই করে রাখতে চেয়েছিলেন আলী আকবর। নার্গিসের মা গরীব, বিধবা, আর তাঁর ভাই গ্রাজুয়েট—আর বিয়েও হচ্ছে খান সাহেবের বাড়ি থেকে, বিবাহে তিনিই উদ্যোগী, অতএব মেয়েপক্ষের সর্বময় কর্তা ওই আলী আকবর খান! ভাগিনেয়ীর উপর মামার আধিপত্য বিসদৃশ ছিল,—মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নার্গিস নিজেও কিছু করতে অক্ষম। সবটুকু জড়িয়ে আত্মমর্যাদাবোধ পদদলিত হচ্ছে এই বোধটাই নজরুলকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এবং তিনি রাতারাতি বীরেন্দ্র সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে আলী আকবরের গ্রাম দৌলতপুর ছেড়ে কুমিল্লায় চলে যান। সেনগুপ্ত পরিবারের আর সকলে পরে ফেরেন।

বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন, কেউ কেউ ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন। যাঁরা আলী আকবরের

সম্যক চরিত্রের পরিচয় পূর্বে পেয়েছিলেন তাঁরা এই বিবাহে আপত্তি জানিয়ে নজরুলকে পত্রও দিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে মুজফ্‌ফর নজরুলকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এই সাবধানবাণীতে কোনো কাজ হয় নি। বিয়ে ভেঙে যাবার পর নজরুল পোস্টকার্ডে মুজফ্‌ফরকে সে সংবাদের সঙ্গে নিজের অসুস্থতার খবরও দিলেন। টাকার দরকার। নজরুল ইন্দ্রকুমারের বাড়িতেই অবস্থান করছেন। চিঠি পেয়ে মুজফ্‌ফর টাকা যোগাড়ের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে নজরুলের অসুস্থতার খবরে বন্ধুমহল উতলা হয়ে বললেন,—কবিকে কলকাতায় আনা হোক, অসুখ যদি বাড়াবাড়ি হয় তাহলে চিকিৎসার জন্য কলকাতাই সবচেয়ে ভালো জায়গা। অবশেষে সামান্য টাকা হাতে নিয়ে মুজফ্‌ফর সাহেব কুমিল্লা রওনা হলেন কবিকে কলকাতায় আনার জন্য।

এখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অন্তরে নিদারুণ যে আঘাত নজরুলের দৈহিক অসুস্থতার কারণ ঘটিয়েছিল, সেই আঘাতের বেদনাই কিন্তু সৃষ্টির উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। এর অব্যবহিত পরেই তিনি যেমন 'এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙিনায়।' 'মরণ-বরণ', 'বন্দী-বন্দনা' প্রভৃতি দেশাত্মবোধের গান লিখলেন, তেমনি 'যাস কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে?'-র মতো একাধিক সার্থক প্রেমের গানও রচনা করলেন। এই বছরেই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতায় দেশের দিকে দিকে সাড়া জাগিয়েছিলেন। কুমিল্লা শহরে যতদিন ছিলেন তিনি সভা-সমিতিতে গান গেয়ে, বক্তৃতা দিয়ে যেন এক জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। আর কলকাতায় ফিরে তিনি সৃষ্টির উন্মাদনা আর জাগরণের দেশজোড়া আন্দোলনে নিজেকে নিঃশর্তভাবে ঢেলে দিলেন।

চিত্তরঞ্জন যখন ১৯২১-এর ডিসেম্বরে গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে যান তার অল্প কিছুদিন পরই অনুরুদ্ধ হয়ে নজরুল 'বাংলার কথা' সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এই পত্রিকাতেই 'ভাঙার গান' প্রকাশিত হয়। এ গানে উদ্‌বারিত বিদ্রোহের আগুন ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষিপ্ত করেছিল। এবং ইংরেজ সরকার গানটি বাজেয়াপ্ত

করেছিল। বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এই গানটির আকর্ষণ আশ্চর্যভাবে বেড়ে যায়। সে সময়ে—

"কারার ওই লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল-পূজোর ওই যে বেদা!...."

গোপনে গায় নি এমন তরুণ খুব কমই ছিল। আর এ গান প্রকাশ্যে গাইলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে ধরবে এও অবধারিত সত্য ছিল। কারামুক্ত হয়ে আসার পর দেশবন্ধু এই দীপ্তিময় তরুণটিকে নিজের খুব নিকটে টেনে নিয়েছিলেন।

জোয়ারের উচ্ছ্বাস যখন আসে তখন তা সর্বসত্তাকেই প্লাবিত করে। দেশপ্রেম, নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম, শিশুর প্রতি বয়স্কের প্রীতি, জীবজন্তু বৃক্ষলতা কিছুই সেই প্লাবন থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। নজরুলের জীবনে সেই জোয়ার বইতে শুরু করেছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। বাচ্ছা মেয়ে কাঠবিড়ালীর সঙ্গে একা-একা কথা কইছে, তাই দেখে তিনি একটি কবিতা লিখলেন:

"কাঠবেরালি। কাঠবেরালি। পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাঁও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি লেবু? লাউ?
বেরাল বাচ্ছা? কুকুর ছানা? তাও?—.....।"

আবার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন এই আত্মবেদনায় তিনি "খাঁচার পাখী" কবিতাটি লিখলেন। 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত এই কবিতাটি পড়ে নজরুল আবেগাপ্লুত হয়ে 'দিল্‌-দরদী' লিখলেন। এই কবিতাতে যেমন দরদের ধারা বয়েছে, তেমনি সবকিছু ছাপিয়ে কবির একাকীত্বের বৈরাগী সুরটি দার্শনিকেরই প্রকাশ ঘটিয়েছে।

"....মুক্ত আমি পথিক পাখী আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের;
বীণ ছাড়া মোর একলা পথের প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি, আঘাত আমার পথিক-ভাই।

আমি এখানে নজরুলের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে বসি নি। ছোট্ট এই নিবন্ধে তার অবকাশও নেই। কাজেই লোভ সম্বরণ ক'রে তাঁর জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ধারা-নির্ণয়ের চেষ্টাতেই থাকা ভালো। তবে এও সত্য যে, কাব্যকে বাদ দিয়ে যেমন কবির জীবন অসম্পূর্ণ তেমনি জীবনীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কিন্তু আমার গণ্ডী যে ব্যক্তি-পরিচিতিতেই সীমাবদ্ধ। নইলে নজরুলের জীবন নিয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে বড় বই লেখার অবকাশ এখনও যথেষ্ট রয়েছে জানি। এই একটি মানুষের মধ্যে মুক্তিসংগ্রামী মানুষের (ভারতের ত বটেই) প্রতীক মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এই একটি মানুষে যেন একটা যুগকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যায়।

'অগ্নিবীণা' বইটি নজরুল যাঁকে উৎসর্গ করেছেন সেই বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মশাই দ্বীপান্তর থেকে ফিরে আসার পর একদিন নজরুল 'বিজলী' অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসেন। সেখানেই নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল, এই আলাপ থেকে এমনই বন্ধুত্ব হ'ল যা সচরাচর দেখা যায় না।

আগেই আমরা দেখেছি যে, কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারে নজরুল তাঁর অভিপ্রেত গৃহের আস্বাদ পেয়েছিলেন। তাই সুযোগ পেলে তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। কখনো বা একনাগাড়ে তিন-চার মাসও সেখানে কাটিয়েছেন নজরুল। ১৯২২-এ কবি যখন দীর্ঘদিন কুমিল্লায় থাকেন সেই সময়ে প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। তবে তখনকার মতো ব্যাপারটা নজরুল এবং চৌদ্দ বছর বয়সের মেয়ে প্রমীলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—অবশ্য গিরিবালা জানতেন। শুধু জানতেন বললে ভুল হবে, তিনিও সমর্থন করেছিলেন।

প্রমীলাকে উদ্দেশ করেই তিনি লিখলেন ঃ

"হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে:
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।......"

কবি যখন নীড়-বাঁধার নেশায় মশগুল তখন অকস্মাৎ কলকাতা থেকে ডাক এল। 'সেবক' পত্রিকায় লেখার জন্য তাঁকে ফিরতে

হবে। মাসিক একশো টাকা মাইনের এই চাকরি। এই চাকরিই কি তিনি করতে পারেন! মাথায় রয়েছে স্বাধীনভাবে পত্রিকা প্রকাশ করা। 'নবযুগ'-এর ছুটে যাওয়ার নেশার ঘোর আবার নতুন ভাবে জাগল। মসউদ আহ্‌মদ নামক জনৈক ভদ্রলোক আড়াইশো টাকা খরচের ঝুঁকি নিচ্ছেন দেখে নজরুল লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর বন্ধু মুজফ্‌ফর যে প্রস্তাব হাস্যকর ব'লে আগেই বাতিল করে দিয়েছিলেন, নজরুল সেটাই গ্রহণ করলেন। পত্রিকার নাম স্থির হল 'ধূমকেতু'। নজরুল চাকরি ছাড়তে পারার এমন সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আড়াইশো টাকার প্রতিশ্রুতি এবং কার্যতঃ মোট দুশো টাকা হাতে নিয়ে এমন কি ১৯২২-এ সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করার খোয়াব দেখার জন্য যে অবাস্তব কল্পনা স্বপ্নের অধিকারী হওয়া দরকার নজরুলের চরিত্রে তার অভাব ছিল না। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করলেন—ধূমকেতু সপ্তাহে দু-বার প্রকাশিত হবে। কিন্তু শেষ অবধি সপ্তাহে একবারই বেরিয়েছে। ওই পুঁজি নিয়ে ধূমকেতু প্রকাশের এই উদ্যোগকে যদিচ খামখেয়ালী বলা যেতে পারে, তবু, নজরুলের ক্ষেত্রে দেখা গেল তিনি হাস্যাস্পদ হলেন না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বারীন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের আশীর্বাদ চেয়ে পত্র লিখেছিলেন তিনি—পেয়েও ছিলেন। আর পত্রিকার বিক্রী ছিল ভালো। বিজ্ঞাপনদাতাদের কেউ কেউ অগ্রিম টাকা দিয়ে সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন।

ধূমকেতু নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন-সাধক হিসেবে কাজ করেছে। আন্দোলনের ঝিমিয়ে-পড়া আবহাওয়াকে চাঙ্গা ক'রে নতুন প্রাণোন্মাদনা এনে দিয়েছিল ধূমকেতু। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন: "স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেন না, কথাটার মানে এক-এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে

এদেশে মোড়লী ক'রে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে।...." এমনি আরও অনেক লেখাই ধূমকেতুতে প্রকাশ হয়েছে। 'ধূমকেতু'র যুগে নজরুল আর একজন অকৃত্রিম বন্ধুর দেখা পেয়েছিলেন, —নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে নজরুলের চরিত্রের বিস্তর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইনি আবেগে, উচ্ছ্বাসে টলোমলো দরদী আর একটি বেপরোয়া বলিষ্ঠ যুবক। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ঝকঝকে তলোয়ারের মতো ধারালো লেখা ধূমকেতুর বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। বলা বাহুল্য, পুলিস বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি। পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা প্রকাশের অজুহাতে প্রকাশক আফজালউল্ হক্ এবং সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা বার হ'ল। নজরুল তখন কলকাতায় ছিলেন না। আফজাল সাহেব ধরা পড়লেন। পরে নজরুলকে কুমিল্লায় পুলিস গ্রেপ্তার করে। কলকাতায় তাঁর বিচার করলেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইন্‌হো। রাজদ্রোহের অপরাধে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড। কয়েক মাস আলিপুর জেলে রাখার পর তাঁকে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জেলে নিয়ে গিয়ে রাজবন্দীর সুবিধা সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, সাধারণ কয়েদী হিসেবেই রাখা হয়। এর প্রতিবাদে তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। এই খবর পেয়ে শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করলেন—"Give up hunger strike, our literature cla·ms you." রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামে ঠিকানা ছিল প্রেসিডেন্সী জেলের। এবং কর্তৃপক্ষের আশ্চর্য তৎপরতায় টেলিগ্রাম বাহক পিওনকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল—ওই ঠিকানায় ওই নামে কেউ নেই! ৩৯ দিন পরে বিরজাসুন্দরীর সাশ্রু অনুরোধে নজরুল অনশন ত্যাগ করেছিলেন। তারপর তাঁকে বিশেষ শ্রেণীর রাজবন্দীর মর্যাদা দিয়ে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারত সরকারের তরফ থেকে বলা হ'ল, সাধারণ দৃষ্টিতে নজরুলের বিশেষ শ্রেণীর বন্দী হিসেবে সুযোগ-সুবিধা পাবার মতো কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই—তবে তিনি সাহিত্যসেবী অতএব তাঁকে সুবিধে দেওয়া যেতে পারে।

বহরমপুর জেলে বসে তিনি যে নাটকটি রচনা করেন তার পাণ্ডুলিপি পরে আর হদিস করতে পারা যায় নি। লেখার পর পাণ্ডুলিপিটি জেলখানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং পথে খোয়া যায় নি। যা ঘটেছে তার পর।

॥ চার ॥

প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে সে-সময়ে সমাজের জল বিস্তর ঘোলা হয়েছিল। ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে নানা বাধা-বিপত্তির ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েই উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। গিরিবালা দেবী ছাড়া সেনগুপ্ত পরিবারের আর সকলেই এই বিয়েতে সায় দেন নি। বরং বলা চলে যে, ওই বিধবা মহিলাটির অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তার ফলেই বিয়ে হতে পেরেছিল। যে নজরুলের লেখা 'প্রবাসী' সাদরে ছাপতো, বিয়ের পর সে দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর আর্থিক ক্ষতি হ'ল—প্রবাসী লেখার জন্য টাকা দিত। ইতিপূর্বেই মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—মোহিতলালের ধারণা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার পিছনে মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধের প্রভাব রয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মোহিতলাল সর্বত্র নজরুলের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু ক'রে দিলেন। সজনীকান্ত দাসও মোহিতলালের সঙ্গে যুক্ত হ'লেন। তিনি 'বিদ্রোহী'কে ব্যঙ্গ ক'রে সেই অনুকরণে 'ব্যাঙ' কবিতা ছাপলেন 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৯২৪ এ, নজরুলের বিয়ের মাস কয়েক পরেই। শনিবারের চিঠির পাল্টা জবাব দিলেন নজরুল 'সর্বনাশের ঘণ্টা'—'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল। এমনি ক'রে দুই পক্ষের লড়াই সাহিত্যের মল্লভূমিকে তাতিয়ে-মাতিয়ে তুলেছিল। বলা বাহুল্য যে বাংলার শক্তিশালী তরুণ প্রগতিবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠী নজরুলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নজরুল শুধু কবি নন, স্বাধীনতার নির্ভীক সৈনিক। তাঁর উদার উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গীতও জনপ্রিয়তার মস্ত সহায় ছিল। কোনো বাধাই তাঁকে দমিয়ে দিতে পারে নি।

বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গিরিবালা দেবী এবং

প্রমীলাকে নিয়ে হুগলীতে বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার পাতলেন। সেই বছরে গান্ধীজী হুগলীতে গিয়েছিলেন—সেই উপলক্ষে নজরুল চরখার গান এবং কবিতা রচনা করেন। কবির সঙ্গে গান্ধীজীর সামনাসামনি পরিচয় ঘটল—আবৃত্তি আর গানে গান্ধীজী মুগ্ধ হলেন।

কংগ্রেসের সভ্য হ'লেও নজরুল গান্ধীবাদী নন্। চরখা আর খদ্দর দিয়ে স্বাধীনতা আনা সম্ভব—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল না। হেমন্তকুমার সরকার এবং আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি ১৯২৫-এ The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress গঠন করলেন। কংগ্রেস পতাকাতলে লেবর-স্বরাজ পার্টি গঠিত হওয়ার পরই মুখপত্র প্রকাশিত হল—'লাঙল'। কলকাতার ৩৭নং হ্যারিসন রোড এই ঠিকানা থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা বার হয়েছিল—এই সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাটি ছাপা হয়। পর পর আর দুটি সংখ্যায় 'কৃষকের গান' এবং 'সব্যসাচী' প্রকাশিত হ'ল। এই সময় অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তার উপর নির্বাচনী প্রচারের কাজে বসিরহাট গিয়ে সেখান থেকে তিনি ম্যালেরিয়া ধরিয়ে ফিরলেন। সাধারণ ম্যালেরিয়া নয়, রক্তবমি, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত পর্যন্ত হচ্ছিল—চিকিৎসা ও সেবায় সে-যাত্রা তাঁকে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত করা হ'ল। মূলতঃ তাঁর বন্ধু আবদুল হালিমের সাহায্যে এবং শাশুড়ী গিরিবালার অক্লান্ত সেবা কবিকে বাঁচিয়ে তুলেছিল।

১৯২৬-এ হেমন্তকুমার সরকারের চেষ্টা ও সাহায্যে নজরুল হুগলী ছেড়ে কৃষ্ণনগরে বাস শুরু করলেন। এই সময়ে নজরুলের রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে প্রমোদ সেনগুপ্ত, গোবিন্দ দত্ত এবং আরও অনেকে রোগজীর্ণ কবিকে নানাভাবে সাহায্য করেন। সে বছরে ফেব্রুয়ারীতে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর যে অনুষ্ঠান হয় তাতে নজরুল নিজের লেখা 'শ্রমিকের গান' গেয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত উদ্‌যাপন করেন। কৃষ্ণনগর সে বছর কংগ্রেসের নানা অধিবেশনের দৌলতে বাংলা দেশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নজরুল

স্বভাবতঃই কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা, উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে মাথা ঘামানো ছাড়াও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল গান রচনা করা। তিনি লিখলেন: 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার':

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"....

তিনি লিখলেন ছাত্র সম্মেলনের গান:

"আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান,
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল।"

কেউ কেউ বলেন যে তিনি কৃষ্ণনগরের যুব সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসেবে

"চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল...."

গানটিও রচনা করেছিলেন। আবার অনেকে দাবি করেন ১৯২৭-এ বর্ধমানে যে মুসলীম ইয়ংমেন্‌স্ কন্‌ফারেন্স হয় সেই উপলক্ষে কবি গানটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য মতও আছে, ১৯২৮-এ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে কবি স্বয়ং এই গানটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। আসল কথা নজরুলের এই সব গান এমনই জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রেছিল যে আজ এর রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ।

কৃষ্ণনগরে থাকার সময়ে রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের উস্‌কানিতে নজরুল নিজেকে নির্বাচনী যুদ্ধে প্রার্থী হিসাবে খাড়া ক'রে বসলেন। হিসেব ক'রে চলা তাঁর স্বভাবে লেখে না—নইলে এভাবে বিধানচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে তিনশো টাকা সাহায্য হাতে নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে ভরসা করতেন না। নজরুল হারলেন—জামিনের টাকাও বাজেয়াপ্ত হ'ল তাঁর। লাভের মধ্যে দেনা বাড়ল।

১৯২৬-এ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় নজরুল বিচলিত হয়ে 'গণবাণী' 'শক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা লেখেন। তাতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত প্রতিফলিত হয়।

'দারিদ্র্য' কবিতাটি লেখার মাস চারেক পরে ১৯২৭-এর এপ্রিলে নজরুলের প্রথম পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়। কৃষ্ণনগরে এর পর আর বেশিদিন তিনি থাকেন নি। বোধ করি সাংসারিক প্রয়োজনের চাপে পড়ে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। আগে থেকে কিছু ঠিক ছিল না তাই প্রথমে সপরিবার নলিনীকান্ত সরকার মশাইয়ের বাসাতেই তিনি উঠেছিলেন। এর পর কিছুদিন এখানে-ওখানে থেকে শেষে তাঁর "ধূমকেতু'র একদা ম্যানেজার এবং মূলতঃ কবির অনুরাগী শান্তিপদ সিংহের চেষ্টায় নজরুল পানবাগান লেনে বাসা করলেন। এই বাড়িতে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র 'সানি' অর্থাৎ সব্যসাচীর জন্ম হয়।

পানবাগানের বাড়িতে আসার পর সুরলোকে নজরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল—তাঁর দেওয়া সুরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। গানের মজলিসে, সভাসমিতির অনুষ্ঠানে অনেকেই নজরুলের রচিত গান এবং তাঁরই সুর-বন্দেজে গাইছেন—অথচ গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফ থেকে নজরুলের কোনো গান রেকর্ড করার অনুরোধ পর্যন্ত আসে না। শোনা যায় বিভিন্ন মহলে এই নিয়ে প্রশ্নের গুঞ্জনে বৃটিশ গ্রামোফোন কোম্পানীর টনক নড়ল। যেহেতু নজরুল রাজনীতি করতেন সেই হেতুই ইংরেজ রেকর্ড কোম্পানী নজরুলকে এতদিন এড়িয়ে চলতেন। যাই হোক, বেনিয়া বুদ্ধির তাড়নায় গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুলকে চিঠি দেবার জন্য ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়ে টের পেলেন যে তাঁদের অজ্ঞাতসারেই নজরুলের গান রেকর্ড হয়ে বসে আছে! রচয়িতার নাম গোপন করে শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের লেখা দুটি কবিতার কিছু কিছু অংশ বেছে নিয়ে সুর দিয়ে রেকর্ড করেছেন। এর পর কোম্পানী ধাক্কা সামলে উঠে গান রচয়িতার প্রাপ্য রয়্যাল্‌টি টাকা পাঠিয়ে ভদ্রতা দেখালেন। এই ভাবেই গ্রামোফান কোম্পানীর সঙ্গে কবির প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করার জন্য কোম্পানী অনুমতি চাইল। তারপর থেকে তাঁর লেখা, সুর-দেওয়া

এবং স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের অজস্র রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানীর আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

ছোটবেলা থেকেই নজরুলের ঝোঁক ছিল গানের দিকে। শিয়ারসোলের স্কুলের শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলাল মশাই ছাত্রের এই দিকে প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তালিমও দিতেন। কাঞ্জিলাল মশাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন। নজরুল যখন পল্টনে ছিলেন তখন পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের তালিম পেয়েছিলেন সহকর্মীদের কাছে। আর গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত তালিম নিতে থাকেন। এক কথায় বলা যায়, নজরুল সুরের সাগরে গা ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে। জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর কবিকে তাঁর শূন্য আসনে গ্রামোফোন কোম্পানী সাদরে বসিয়েছিলেন—পদটি ছিল 'ট্রেনার' ও 'হেড কম্পোজার'।

১৯৩০-এ নজরুল পুত্রশোক পেলেন, বৈশাখ মাসে তাঁর নয়নমণি বুলবুলের মৃত্যু হ'ল। ওইটুকু বয়সেই সে জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব এবং নজরুলের সঙ্গীত চর্চার মধ্যে থেকে নির্ভুল সুরে গান গাইতে শিখে ফেলেছিল। তার অকালমৃত্যু পরিবারের উপর গভীর বিষাদের ছায়া ফেলল। নজরুলের আধ্যাত্মিক দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণই সম্ভবতঃ বুলবুলের মৃত্যু। এর আগে শোক থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি হাসির গান লিখতে গিয়ে একা একা বসে কেঁদেছেন, এও তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ দেখেছেন। আধ্যাত্মিক দিকে পা ফেলার কারণই ছিল, বুল্‌বুল্‌কে চোখের দেখা দেখতে পাওয়া। সেই আশায় তিনি লালগোলা স্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যান নলিনীকান্ত সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে। সিদ্ধযোগী বলে মজুমদার মশাইয়ের খ্যাতি ছিল—তবে তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি গৃহী যোগী। শোনা যায় যে বরদাচরণ নজরুলের এই কামনা চরিতার্থ করেছিলেন—নজরুলের চোখের সামনে বুলবুল এসে দাঁড়িয়েছিল। এর পর স্বভাবতঃই নজরুল মজুমদার মশাইএর

সঙ্গে হামেশা দেখা করতে লাগলেন। মজুমদার মশাই শ্মশানে গিয়ে কালী-সাধনা করতেন। তবে তিনি আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন এবং সাধনক্ষেত্রে অন্য কাউকে টানা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ববং তিনি অনধিকারীকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্পর্কে আমি তাঁর ভাগিনেয়। কবি অধ্যাত্ম-সাধনমার্গে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা বলার অধিকার আমার নেই, তবে এই পথে জোর করে পা দিতে গিয়ে বরদাচরণের মাসতুতো ভাই (নিবন্ধকারের আপন মামা) হরেন সান্যাল মশাইএর সাময়িক মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল এটা আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। হরেন মামা বরদাচরণের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে গোপনে দাদার পিছু পিছু শ্মশান অবধি গিয়েছিলেন—তারপর কী ঘটেছিল তা কেউ জানে না, তবে তিনি দু-হাত চোখের সামনে তুলে "রক্ত—রক্ত—রক্ত" আর্ত চিৎকারে সকলকে উচ্চকিত ক'রে বাড়ি ফিরেছিলেন! সে যা-ই হোক, নজরুল যে অধ্যাত্মশক্তি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং এর প্রভাব তাঁর বাস্তব জীবনকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করেছিল এটুকু নির্ণয় করা যাচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

১৯৪২-এর জুলাই মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রামে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে কবি টের পেলেন তাঁর জিহ্বা কাজ করছে না—কথা বলতে গিয়ে গলা আটকে আসছে। তার আগে থেকেই তিনি নিজের অসুস্থতা বুঝতে পেরেছিলেন, তবে তেমন গ্রাহ্য করেন নি। রেডিওর প্রোগ্রাম করা সম্ভব হ'ল না, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন,—কবি অসুস্থ। এর পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এই সময়ে কবি দৈনিক 'নবযুগ'-এর সম্পাদক ছিলেন। লুম্বিনী পার্কের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার পর মধুপুরে বায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রামের জন্য পাঠানো হ'ল।

অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নজরুলের অসুখটা

দেহে আত্মবিস্তার লাভ ক'রেছিল। কাজেই যখন তাঁর চিকিৎসা শুরু হ'ল তখন তা উপশমের বাইরে চলে গেছে। অন্যান্য দেশে কী হয় তা আমার জানা নেই, তবে আমাদের এদেশে শিল্পী, সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষদের ভাগ্যে যশ-খ্যাতি যতোই জুটুক আর্থিক ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই-এরও বেশি জন উপেক্ষিত রয়ে যান—এটা অস্বীকার করা চলে না। নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রথম বই 'ব্যথার দান' মাত্র দুশো (?) টাকায় স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়েছিল। হয়ত তখনকার দিনে দুশো অনেক টাকা। 'কপিরাইট' না বেচলে হয়ত তখন তাঁর অতি-বড় বন্ধুও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য হাতে নিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় কপিরাইট বিক্রীটা ঘটে ওই একই বছরে, অর্থাৎ ১৯২১-এ—এবার 'রিক্তের বেদন' এবং আরও দুটি বই মাত্র চারশো টাকায় স্বত্ব বিক্রী করলেন তিনি। 'অগ্নিবীণা' এবং 'যুগবাণী' প্রথম দিকে কপিরাইট বিক্রি করা হয় নি। যাঁরা নজরুলের লেখার অনুরাগী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করলেও, সরকারী ঝামেলার ভয়ে প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম ছাপাতে রাজী হন নি—আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে 'যুগবাণী' এবং 'অগ্নিবীণা' প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নামাঙ্কিত হয়েই বেরিয়েছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য 'অগ্নিবীণা'র কপিরাইট কেনেন ডি এম লাইব্রেরী। ডি এম লাইব্রেরী নজরুলের অধিকাংশ বই-ই প্রকাশ করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির আগে নজরুল পরিবারের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ তাঁর লেখার রয়্যালটির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাঁর 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত বইগুলি অনেকে গোপনে কিনতেন এবং সেই বিক্রির টাকা নজরুল পরিবারের আর্থিক দুর্দিনে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। কেননা কোনো চাকরিতেই তিনি স্থির ভাবে বেশিদিন থাকতে পারতেন না।

অনেকের ধারণা নজরুলের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু ব্যয়ের হাতখানা তাঁর এমনই দরাজ যে, টাকা যেমন এসেছে তেমনি হাওয়ার আগে উড়ে গিয়েছে। এর খানিকটা অস্বীকার করা চলে না—বন্ধু-বান্ধবদের

খাইয়ে অথবা তাঁদের নিয়ে বেড়ানোর পিছনে তাঁর কম খরচ হয় নি। হিসেব ক'রে চললে হয়ত স্ত্রী প্রমীলার অসুখের সময়ে 'এইচ-এম-ভি'-র সমস্ত গানের রয়্যালটি বন্ধক রেখে তাঁকে চার হাজার টাকা ধারও করতে হত না। এমনি আরও অনেক অসুবিধের হাত থেকে নজরুল এবং তাঁর পরিবার নিষ্কৃতি পেতেন হয়ত—কিন্তু তাতে ক'রে নজরুল হয়ত কবি নজরুল হতে পারতেন না, কাজীই রয়ে যেতেন হয়তো। নজরুল—নজরুলই।

তবে আক্ষেপ এই যে, নজরুলের মতো শক্তিধর প্রতিভার লেখনী হঠাৎ স্তব্ধ হ'ল, তারও আগে কণ্ঠ! বহুদিন হ'ল তাঁর মস্তিষ্ক কোনো কাজ করে না। ভারত ও পাকিস্তান সরকার কবিকে রোগমুক্ত করার আশায় দেশ-বিদেশে সম্ভাব্য সকল প্রকার চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কবি-জায়া ১৯৩৯-এর অসুখে শয্যাগ্রহণ করেন—তারপর থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ আবৃত্তি এবং বাদ্যযন্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। কাজী অনিরুদ্ধ কবির আগেই পরলোকগমন করেছেন।

নজরুলের কবিতা, তাঁর গান আজও বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে সমাদৃত। দিন যত যাচ্ছে তার আদর ততই বাড়ছে। এই একটি ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের সরকারী বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি—এ কী কম কথা! কবি নিজে যে স্বপ্নকে জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টিও সেই হিন্দু ও মুসলীমের বিরোধকে অগ্রাহ্য ক'রে আপন দীপ্তিতে ভাস্বর।

বাংলাদেশ গঠিত হবার পর শহীদ নেতা মুজিবর রহমান তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে সসম্মানে ঢাকায় নিয়ে যান। কবি সেখানেই ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট পরলোকগমন করেন।

—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

নজরুলের সঙ্গে দুটি সন্ধে

নজরুলের সঙ্গে একবার এক বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলাম। যাত্রা ভবানীপুর থেকে বাগবাজার।

শ্রাবণের সন্ধ্যা। আকাশ মেঘলা করে আছে কিন্তু বাস-ভরতি লোক খুশিতে রৌদ্রোজ্জ্বল। আনন্দ আর কিছুতে নয়, আনন্দ একত্র যাত্রায়।

বাস থেকে নজরুল আমাকে ডাকল, চলে এস।

আমি বললাম, জায়গা হবে না।

খুব হবে। হৃদয়ে জায়গা থাকলে সর্বত্র জায়গা আছে। চলে এস।

তোমাদের গাড়িতে খুব চাপাচাপি হচ্ছে, তারপর আমি উঠলে তোমাদের কষ্ট হবে।

আমাদের আবার কষ্ট! দে গরুর গা ধুইয়ে।

সমস্ত রাস্তা গুলতানিতে মাতিয়ে রাখল নজরুল। একাই এক হাজার। সমস্ত কথা সে বলবে, সমস্ত গল্প সে শোনাবে, সমস্ত হাসি সে হাসাবে। ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যে-প্রাখর্যে প্রাচুর্যে-মাধুর্যে সে একেবারে অনন্য। তার প্রাণই এক বিপুল বৈভব। আর তাতে কোনো অবসাদ নেই। অপরে তার কেউ না-হোক, সে সকলের আপন। দলে থাকলে দলের, একলা জনের একলার।

সাক্ষাৎমাত্রই স্ফূর্তি, সাক্ষাৎমাত্রই অভিনন্দন, সাক্ষাৎমাত্রই জীবনোচ্ছ্বাস!

বরের গাড়ি আগে পৌঁচেছিল, মামুলী উলু ও শঙ্খধ্বনিও উঠেছিল, কিন্তু নজরুলদের বাস এসে পৌঁছুতেই উত্তাল উল্লাসে দশদিক মুখর হয়ে উঠল। কাজী এসেছে—কাজী নজরুল। পরনে তাঁতের কালো পাড় ধুতি, গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দরের অঢেল পাঞ্জাবি, কাঁধে রঙিন উড়ুনি, নজরুল বুঝি বরের চেয়েও বরণীয়। যত লোক এসেছে সকলের মধ্যে নজরুলই বরীয়ান। ওকে পেলে কে আর বরের খোঁজ করে!

প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসে গানের আসর বসে গেল তক্ষুনি। যেখানে নজরুল সেখানেই গান, সেখানেই প্রাণ, সেখানেই অফুরান। কোত্থেকে একটা হার্মোনিয়ম এসে জুটল, গান ধরল নজরুল।

কিন্তু আশ্চর্য, নিজের গান না গেয়ে ধরল রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তোমার সুখের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়—দেবে কি—একটি ধারে।

গান শেষ হতেই ফেলুদা, উমাপদ ভট্টাচার্য, টেনে নিল হার্মোনিয়ম। সে ধরল ঃ

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।

নজরুল যদি ধরে, দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে, ফেলুদা ধরে, গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।

হঠাৎ আলোর তার ফিউজ্‌ড হয়ে গিয়ে সমস্ত বাড়িঘর আদ্যোপান্ত অন্ধকার হয়ে গেল।

বাড়ির ভিতর বিয়ের জায়গায় গিয়ে দেখি বড়-বড় মাটির প্রদীপের আলোয় বিয়ে হচ্ছে। হচ্ছে মুখচন্দ্রিকা। 'বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।' সেই আলোতে বর-বধূ পরস্পরের মুখ দেখছে।

এত বড় বিপর্যয়েও গানের আসরে কোনো গোলমাল নেই। কেননা অন্ধকারেই নজরুল গান ধরেছে। এবার তার নিজের গান। বিয়ের জায়গা থেকেও সে গান শোনা যাচ্ছে।

মোর ঘুমঘোরে এল মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম॥
শিয়রে বসি চুপিচুপি চুমিলে নয়ন
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপসম, নিরুপম, মনোরম॥

সে যে কী পরিবেশ তৈরি করেছিল নজরুল তার মধুরমদির স্মৃতি চল্লিশ শ্রাবণেও অক্ষয় হয়ে আছে।

তারপর আবার হঠাৎ আলো ফিরে এল। নজরুল নিজের রচিত আরো অনেক গজল গাইল। আমাকে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী—এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে? শেষ গানটা বুঝি গাইল—

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গনি সকলি ফাঁকা।
আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা॥

এ থামতে জানে তো? এ প্রশ্ন বোধ হয় নজরুল সম্পর্কে নয়; এ থামে কেন? এইটেই সকলের আপসোস।

তারপর সকলের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন সেরে কখন নজরুল বাড়ি চলে গেল কোনো খবরই রাখি না।

দুদিন পরে তাকে বউ-ভাতে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলাম। দেখতে দেখতে একতলার বৈঠকখানায় বিস্তীর্ণ আসর বসে গেল। যেখানে নজরুল সেখানেই গান, সেখানেই প্রাণ, সেখানেই অফুরান।

এ আসরে গাইল সে নতুন গান—ভাঙার গান, সর্বহারার গান।

আজ জাগরে কৃষাণ, সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যু রাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল॥

আবার ধরল শ্রমিকের গান:

যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা উজির মারছে মজা
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল॥

যত লোক নিমন্ত্রণে আসছে সবাই গানের টানে নিচেই জমে যাচ্ছে, উপরে নববধূর কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে না। বারান্দায় উঠোনে রাস্তায় লোক উপচে পড়ছে। মাইক নেই, তবু নজরুলের তেজস্বী কণ্ঠে মাধুর্যের স্রোত বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে মানুষকে টেনে আনছে।

শুধু একজনকেই নড়াতে পারছে না। সে আর কেউ নয়—নবোঢা ভদ্রমহিলা। উপরের ঘরে গিয়ে দেখি প্রায় একলাটি বসে আছেন। তার বুঝি কিছু শোনাও হল না দেখাও হল না।

নজরুল তখন তার আসরের শেষ গান গাইল :

পিও সরাব পিও
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমিরপুরে
তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া রবে না সাথে॥

নজরুল আসর ছেড়ে উপরে উঠে এল হাতে একগাদা বই নিয়ে। সব তার নিজের লেখা বই। একটা একটা করে সব কটা বইয়ে উপহার লিখে নববধূর হাতে তুলে দিল। রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ-এ লিখল :

অন্ন যেমন ধন্য হল আজকে পাকস্পর্শে
প্রাশনে তা ধন্য যেন হয় আগামী বর্ষে।

শেষ বই বুলবুল। উপহারে নববধূর বিশেষণ লিখল 'অচিন্ত্যনীয়াসু'।

আমি সবিনয়ে বললাম, য-ফলাটা বোধ হয় হবে না।

নজরুল সহাস্যে বললে, তা না হলে এ যে তোমার স্ত্রী তা বোঝা যাবে কী করে?

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার শ্বশুরমশাই

'বাবা'র সম্পর্কে কোনদিন এরকম একটা লেখা লিখতে হবে ভাবি নি! ভারাক্রান্ত মনে স্মৃতিচারণ করছি আর এজাতীয় কাজ ঠিকমত করা যে কতখানি কঠিন তা যিনি লেখিকা নন তিনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন! এ অবস্থায় (তাব উপর আমি শারীরিক অসুস্থ) ঘটনাক্রম আগে পরে হয়ে যেতে পারে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আমি আগে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

যে বিরাট মানুষটির সম্পর্কে আমাকে লিখতে বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁকে আমি কখনও সুস্থ অবস্থায় দেখি নি। আমার বিয়ের দশ বছর আগে থেকেই উনি অসুস্থ হয়ে আছেন। সাধারণে জানেন, কবির কোনরকম বোধশক্তি ছিল না। আমার কিন্তু মনে হয়, পুরোটা না হলেও কিছুটা অন্তত ছিল। একদিনের একটা ঘটনার কথা বললেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

হঠাৎ-ই একদিন আমার শখ হলো ওনার অটোগ্রাফ নেব। খাতা-কলম নিয়ে গেলাম ওঁর কাছে। উনি আপনমনে বসে বিড়বিড় করছেন। স্বামী ছিলেন সেখানে। উনি বাবার হাতে কলমটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা বাবা, ও তোমার সই চাইছে।

বাবা কয়েকবার ওর আর আমার মুখের দিকে চাইলেন তারপর কলম ধরে খাতাতে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন আমার স্বামীর নাম। আমরা তো অবাক। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে উনি বাবার বুকে আঙুল রেখে বললেন, আমার নাম নয়, তোমারটা লেখ, তোমার সই চাই।

বারকয়েক বলতে কাজ হলো। বাবা খাতাতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন, কাজী নজরুল ইস্‌....না, পুরোটা নয়, শেষ দুটো অক্ষর লেখার সময়েই লেখাটা জড়িয়ে গেল। সম্ভবত ওটাই বাবার শেষ হস্তাক্ষর। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি।

তারপর সেই হাজারীবাগ। বেশ কিছুদিন আমরা ওখানে কাটিয়েছি। সেখানে প্রায়দিনই বিকালে বাবাকে নিয়ে বেড়াতে

বেরুলে, উনি এত জোর হাঁটতেন যে, আমরা সুস্থ মানুষেরা না ছুটে তাঁর নাগাল পেতাম না। আমার স্বামী উইক-এণ্ডে গাড়ি নিয়ে যেতেন হাজারীবাগে। গাড়িতে চড়ে বাবার কি ভীষণ আনন্দ! সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, উনি গাড়ি ব্যাক করলেই বাবা পিছন দিকে তাকাতেন। বোধশক্তি রহিত হলে এমন কি কখনও হয়?

বেশ মনে পড়ে বিয়ের পর বাবাকে প্রণাম করা হয়ে গেলে উনি বললেন, বাবা এই দেখ আমার বউ, তোমার মিনির (স্বর্গত কাজী অনিরুদ্ধর ডাকনাম) বউ! দু'তিনবার বলতেই বাবা হেসে মাথা নাড়লেন।

বাবা যে প্রিয়জনদের নির্দেশ বুঝতেন—একটা গোটা দিনের কথা বললেই তা বোঝা যাবে। মা তখন বেঁচে। উনি ছিলেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কোমর থেকে বাদবাকি শরীরের অংশ ছিল অসাড়। ওপরের অংশ ছিল সুস্থ। সেটুকু উনি কাজে লাগাতেন। চৌকির উপর শুয়ে শুয়েই 'কুটনো কুটতেন, রান্না করতেন আর বাবাকে দেখাশুনা করতেন। রাখতেন নজরে নজরে।

মা রোজ সকাল আটটায় দুধ আর পাঁউরুটি মেখে ডাকতেন বাবাকে। ডাকটা ছিল, 'কৈ এদিকে এস, খেয়ে যাও।' পাশের ছোট ঘরটায় থাকতেন বাবা। দু'ঘরের মাঝে ছিল পর্দার ব্যবধান। ডাক পড়লেই বাবা চলে আসতেন এ ঘরে। আসন পাতা দেখলে তবেই বসতেন খেতে, নচেৎ নয়। মা শুয়ে শুয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন বাবাকে। আমাদের বাড়ির দুই ভৃত্য কিশোর সাহু আর কাট্টু সিং স্নান-টান করিয়ে দিত। বেলা বারোটা বাজলেই বাবা উশখুশ করতেন খাওয়ার জন্য। ঘন ঘন দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাতেন। খাওয়ার পর আমরা বিছানা দেখিয়ে যদি বলতাম, 'বাবা শুন' অমনি লক্ষ্মী ছেলের মত উনি শুয়ে পড়তেন। যদিও দুপুরে তিনি বড় একটা ঘুমাতেন না। সারা দুপুর পায়চারি করে বেড়াতেন বাড়িময়। বিকালে কেউ গান শোনাতে এলে উনি খুব খুশী হতেন। গানের সঙ্গে তাল দিতেও দেখেছি। গানের সঙ্গে তবলা বাজলে তো আর কথাই নেই, খুশীতে একেবারে

ডগমগ হয়ে উঠতেন। দেশাত্মবোধক গান পছন্দ করতেন ভীষণ ভাবে। আর কেউ না এলে একা একা বসে থাকতেন কি পায়চারি করতেন গোটা বাড়ি। সদর দরজার কাছে, কখনও কি বাথরুমের কাছাকাছি চলে গেলে মা যদি বলতেন 'এই ওদিকে যেও না।' বাবা কখনই সেদিকে যেতেন না, ঘুরে চলে আসতেন নিজের ঘরে। সাড়ে আটটা কি ন'টার সময় রাত্রের খাওয়া খাইয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু বাবা কিছুতেই ঘুমাতেন না। জেগে থাকতেন অনেক রাত পর্যন্ত। আর বাবাকে পাহারা দেবার জন্য মাকেও জেগে থাকতে হতো। তাই আমরা যখন সকাল সাড়ে ছ'টা, সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠতাম তখন দেখতাম বাবা-মা দুজনেই ঘুমোচ্ছে।

এই ছিল বাবার সারাদিনের রুটিং। ওনার অভ্যাস ছিল, কাগজ ছেঁড়া আর বাড়িতে যেখানে যত কাগজ পাবেন সব কুড়িয়ে এনে ছিঁড়ে বালিশের তলায় রাখা!

একদিন হয়েছে কি, বাবা তো দুপুরবেলা পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন সারাবাড়ি, ঐ ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো পেয়েছেন। উনি করলেন কি সেটা এনে রেখে দিলেন বালিশের তলায়। আমি তখন ঘুমিয়ে। হঠাৎ মার চিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। ছুটে গিয়ে দেখি ও-ঘরের বিছানা ও পর্দা জ্বলছে দাউ দাউ করে। 'অগ্নিবীণা'র কবি কিন্তু বসে আছেন আগুনের মাঝে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, ওনার গায়ে একটা ছ্যাঁকাও লাগে নি। উনি যেভাবে নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন সেইভাবেই বসে আছেন। আগুন যে লেগেছে তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর।

আরেকদিনের ঘটনার কথা বলি, আমার বড় ছেলে অনির্বাণ তখন খুব ছোট। দোলনায় শুয়ে থাকার বয়স। ওর দোলনাটা ছিল মা'র চৌকির একপাশে। যাতে মা নজরে নজরেও রাখতে পারেন, আবার হাত দিয়ে দোলনাও দোলাতে পারেন।

এক দুপুরে হলো কি, অনির্বাণ কেঁদে উঠলো খুব জোরে। বাবা তখন ছিলেন ঐ ঘরে। অবাক কাণ্ড, মুখ দিয়ে অব্যক্ত আওয়াজ করে মাকে সচেতন করলেন। মা'র বুঝতে কোন অসুবিধা হলো না,

উনি ইশারায় অনির্বাণকে কোলে নেবার জন্য বলছেন। আমি ও আমার স্বামী দু'জনেই গেছি ওঘরে। বুদ্ধিটা প্রথম এলো ওঁর মাথায়। উনি মাকে বললেন, তুমি বাবাকে বল অনির্বাণকে তোমার কোলে দেবার জন্য।

মা তো ভয় পেয়ে বললেন, 'না না, বাচ্চা ছেলে যদি ফেলে দেন উনি!' আমরা মাকে বোঝালাম—না, আমরা তো পাশে থাকব, কিছু হলেই ধরে নেব।

মা তখন রাজী হলেন আমাদের প্রস্তাবে। বাবাকে বললেন, ওকে আমার কাছে দাও।

বাবা প্রথমে বোঝেন নি, তারপর কয়েকবার ইশারায় বলতে বুঝতে পারলেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম, বাবা এক হাত দিয়ে অনির্বাণকে দোলনা থেকে তুলে মা'র কাছে দিয়ে দিলেন।

প্রতি বছর জন্মদিনের দিন বাবা বুঝতে পারতেন যে আজ তাঁর জন্মদিন। সারাদিন কি ভীষণ খুশী থাকতেন উনি! নতুন জামা পরালে আনন্দ পেতেন খুব। সেদিন কারো গানে খুশী হয়ে মালা খুলে দেওয়ার ঘটনার কথা তো অনেকেই জানেন। উনি রেগে যেতেন চশমা পরে বা ছাতা হাতে কেউ সামনে এলে। আর গালের দাড়ি বড় হলে সহ্য করতে পারতেন না একদম। নাপিত যখন দাড়ি কামিয়ে দেবার জন্য আসতো, তখন একেবারে লক্ষ্মীছেলের মত বাবু হয়ে বসতেন। স্পষ্টই বোঝা যেত উনি বুঝেছেন এখন ওঁর দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হবে।

আমার সঙ্গে বাবার শেষ দেখা হয় ঢাকায় ১৯৭৪ সালে। অনির্বাণকে সঙ্গে নিয়ে সেবার গিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম, না স্বপ্নেও ভেবেছি ওটাই শেষ দেখা। আর এবার মৃত্যুর খবর শুনে ছুটে গেলাম ঢাকাতে, কিন্তু শেষ দেখা হলো না। বাংলাদেশ সরকার বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি ওঁর অন্তিমকার্য সমাধা করলেন। অত তাড়াতাড়ি না করে ওঁর নিকটজনদের শেষ দেখার সুযোগটা পাইয়ে দিলে আমার মনে হয় তাঁরা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিতেন।

—কল্যাণী কাজী

কবি প্রণাম

কাজী সাহেব সম্বন্ধে কিছু লেখার অনুরোধ আসবে এ কথা কোনোদিন ভাবি নি, তাই সেভাবে তাঁকে কোনোদিন দেখিও নি।

প্রথম যখন কবিকে দেখি আমি একেবারে নাবালিকা হয়ত ছিলাম না। কিন্তু কবি-মানসকে বোঝবার, দেখবার অথবা উপলব্ধি করবার মত সে-রকম কোনো পরিণত জ্ঞান বা বুদ্ধির অধিকারীও ছিলাম না। কাজেই সেদিকে কোনো আলোকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ ফিল্মের প্রয়োজনেই তাঁর কাছে কিছু গান শেখবার সুযোগ ঘটেছিল। সেই উপলক্ষেই আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলবার চেষ্টা করছি এবং এ বলাকে কোনো সাহিত্যকৃতি বলে আমি দাবি করি না এ কথাও সবিনয়েই জানিয়ে রাখছি।

মেগাফোনেই বোধ হয় কাজী নজরুলের সুর ও পরিচালনায় রেকর্ড করার সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। শুনেছিলাম তিনি বিদ্রোহী কবি—তাঁর কাব্য তরুণ সম্প্রদায়ের সংগ্রামের প্রেরণা—পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করাই তাঁর জীবনসাধনা। তিনি যোদ্ধা, বীর এমনই অনেক কিছু। এসব শুনে অজ্ঞাতেই তাঁর প্রতি মনটা শ্রদ্ধালু হয়েছিল কারণ স্বাধীনতা মুক্তি তারুণ্যের রঙিন স্বপ্ন এসবের প্রতি কার না আকর্ষণ থাকে? একদিন ৺জে. এন. ঘোষ মেগাফোনের রিহার্সাল রুমে কবির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে চেয়ে দেখি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক হার্মোনিয়মের সামনে বসে আস্তে আস্তে বাজাতে বাজাতে গুন গুন করে সুর ভাঁজছেন চোখ বুজে। কখনও এধার-ওধার তাকাচ্ছেন, কিন্তু কোনো কিছুর উপরই ঠিক যেন মন নেই। একসময় হার্মোনিয়ম থামিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। দীপ্ত দুটি চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যেই যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব কথা বলে উঠল। ঐ চোখ দুটিই যেন তাঁকে দেখিয়ে দেয়। পরিচয় হওয়া মাত্রই হয়ত বা সঙ্কোচ ভাঙাবার

জন্যই খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার গান ও গলার প্রশংসা শুরু করে দিলেন। খুব প্রাণখোলা হাসিখুশী স্ফূর্তিভরা মানুষ—যাকে বলা যায় আনন্দময় ব্যক্তিত্ব। জে. এন. ঘোষ শিল্পীদের যত্ন করতেন ঠিক যেন মাতৃস্নেহে। "আমার ত খিদে পেয়েইছে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে কাননেরও খিদে পাচ্ছে। দাদা এবার একটু তৎপর হন" বলে উদার হাসিতে কাজী সাহেব ঘর ভরিয়ে দিলেন। জে. এন. ঘোষ ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে থালাভরা খাবার মিষ্টি আর একটা প্লেটে পানজর্দার স্তূপ এনে হাজির করতেই "খাও" বলে একরাশ মিষ্টি আমার হাতে তুলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে নিজের সব খাবার নিঃশেষ করে দিলেন। হৈ চৈ করে যেমন একসঙ্গে বিস্ময়কর পরিমাণ খেতে পারতেন ঠিক তেমনি বিস্ময়কর ভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাওয়া-খাওয়া সম্বন্ধে বেহুঁশ হয়ে শুধু মাত্র সুর রচনা নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। আর সে কি আশ্চর্যভাবে মেতে থাকা! না দেখলে কল্পনা করা যায় না। কখনও যদি কোনো সুর মনে এল তারই সঙ্গে মিলিয়ে কথা বসানো, কখনও বা কথার তাগিদে সুর। আমি ত রাগরাগিণী কিছু বুঝতাম না। কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না কি সীমাহীন ব্যাকুলতায় তিনি কথার ভাবের সঙ্গে মেলাবার জন্য হার্মোনিয়ম তোলপাড় করে সুর খুঁজে বেড়াতেন। ঠিক যেন রাগের মর্ম থেকে কথার উপযুক্ত দোসর অন্বেষণ।

আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বলতেন, "ডাগর চোখে দেখছ কি? আমি হলাম ঘটক, জানো? এক দেশে থাকে সুর, অন্য দেশে কথা। এই দুই দেশের এই বর কনেকে এক করতে হবে। কিন্তু দুটির জাত আলাদা হলে চলবে না, তাহলেই বে-বনতি। বুঝলে কিছু?" বলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকাতেন। আমি মাথা নেড়ে স্পষ্টই বলতাম, "না বুঝি নি।" বলতেন, "পরে বুঝবে।" পরে বুঝেছি কিনা জানি না, তবে এইটুকুই আজ বোঝবার কিনারায় এসেছি সে কথার মত অতিবাস্তব বস্তুর বুকেও অসীমে ব্যাপ্ত হবার তৃষ্ণা জাগানো এবং সুরের মত অ-ধরাকেও কথার মাধুর্যে বন্দী করার মিলন উৎসবে যিনি আত্মহারা—তাঁর

কবিকৃতিকে উপভোগ করা যতখানি সহজ ব্যক্তিত্বকে বোঝাটা ঠিক ততখানি নয়।

ছবির গান ও সুর বাঁধার সময়ও দেখেছি কত প্রচণ্ড আনন্দের মধ্যে কি প্রবল ভাবেই না কবি বেঁচে উঠতেন, যখন একটা গানের কথা ও সুর ঠিক তাঁর মনের মত হয়ে উঠত। মানুষ কোনো প্রিয় খাদ্য যেমন রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করে কাজী সাহেব যেন তেমনি করেই নিজের গানকে আস্বাদ করতেন।

শেখাতে শেখাতে বলতেন—মনে মনে ছবি এঁকে নাও নীল আকাশ দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। তার কোনো সীমা নেই, দুদিকে ছড়ানো ত ছড়ানোই। পাহাড় যেন নিশ্চিন্ত মনে তারই গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আকাশের উদারতার বুকে এই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনোটা প্রকাশ করতে হলে সুরের মধ্যেও একটা আয়েস আনতে হবে। তাই একটু ভাটিয়ালির ভাব দিয়েছি। আবার ঐ পাহাড় ফেটে যে ঝর্ণা বেরিয়ে আসছে তাঁর চঞ্চল আনন্দকে কেমন করে ফোটাব? সেখানে সাদামাটা সুর চলবে না। একটু গীটকিরী তানের ছোঁয়া চাই। তাই "রো—ও ও—ও—অই—" বলে ছুটলো ঝর্ণা আত্মহারা আনন্দে।

এমনই করে তিনি এই মেলানোর আনন্দ আমাদের হৃদয়েও যেন ছড়িয়ে দিতেন।

আজ কবির দুঃখলগ্নে সেই সব টুকরো স্মৃতি যেন কবির সেই অতিজীবন্ত কর্মমুখরতাকে বিষণ্ণ আলোর আভায় করুণ করে তুলেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কবি কি সত্যিই নীরব? না আপন ধ্যানের জগতে সমাহিত বলেই বাইরের কোনো কোলাহল তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারছে না? এককালে দেখা মাত্রই আনন্দে যাঁর মন ভরে উঠত আজ তাঁকে নীরব প্রণাম জানিয়ে চলে আসা ছাড়া কিছু করার নেই। জন্মদিনে কবিকে ঘিরে সকল উৎসব সভা যখন তাঁরই গানে, কথার সুরে ঝলমল করে ওঠে, তখন কবিরই ভাষায় তাঁকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, "ফুলেরি জলসায় নীরব কেন কবি?"

—কানন দেবী

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম—এ নাম এককালের আশ্চর্য বিস্ময়কর নাম। এ কালে সে নামের সঙ্গে আরও অনেক কিছু যুক্ত হয়ে আরও শ্রদ্ধা ও বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে রাষ্ট্র সমাজ আজ তাব শ্রদ্ধা মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে কালের কথা আমি বলছি সে-কালের সে-বিস্ময়ের সঙ্গে বুঝি কিছুর তুলনা হয় না।

কালবৈশাখীর ঝড় আসে, কিন্তু এক-একটা ঝড় আসে তার চিহ্ন পৃথিবী বহন করে শত বৎসর পর্যন্ত। আড়াইশো-তিনশো বছরের চিহ্ন আমি দেখেছি। আড়াইশো বছর আগে মাঠের মধ্যে একটা বিরাট বিশাল বটগাছ শিকড়সুদ্ধ নিয়ে এক কালবৈশাখীর ঝড়ে উল্টে উপড়ে পড়েছিল। গাছটার ডালপালা লোকে কেটে নিলে পোড়ালে —তার চিহ্ন কেউ রাখে নি কিন্তু যে গর্তটা হল ও মাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে গাছটা ওল্টানোর ফলে সেটা আয়তনে এবং গভীরতায় এমনই অসাধারণ যে-গাছটার স্থলে যে খাতের সৃষ্টি হল—সেটাকে চারিয়ে ক্ষেত করা গেল না, বাগান করাও গেল না, তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা নিয়ে সে হ'ল একটা ছোট বাঁধ। পুকুরটার নাম আজ 'ঝড়ের বাঁধ'। 'ঝড়ের বাঁধে' আজও জল থাকে, তা থেকে আজ সিচন হয়। ওর মধ্যে আড়াইশো বছর আগের ঝড়টার পাঞ্জার ছাপ আজও স্পষ্ট। এক্ষেত্রে অস্বীকৃতির কোন প্রশ্নই ওঠে না; স্বীকৃতি অস্বীকৃতির কোন প্রতীক্ষা না-করেই ঝড় আসে এবং যেখানে আসন নেবার যেখানে পাঞ্জার ছাপ আঁকবার তা এঁকে দিয়ে যায়।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই কালবৈশাখীর ঝড়। শুধু সাহিত্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালীর সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর জীবনী লিখেছেন—নাম দিয়েছেন 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়'। ঝড় তিনি তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার হৃদয় ক্ষেত্র থেকে এক বিস্ময়কয় আবেগ, সেদিন খাঁটি বাঙালীত্বময় প্রকাশে

প্রকাশিত হয়েছিল--তিনি তাই। বাংলাদেশের নবীন প্রাণের হৃদয় থেকে অবরুদ্ধ গান—সেদিন তাঁর কণ্ঠ দিয়েই বের হয়ে এসেছিল।

আমি সেকালে গ্রামবাসী। নেহাৎই গ্রাম্য জন, মাত্র একানে দেশকর্মী। সাহিত্যে পিপাসু জন মাত্র, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বরাতী প্রীতি উপহার লিখি—এবং গোপনে—দেশকে বন্দনা করে কবিতা লিখি। পূজার সময় কবিতা রাজদ্রোহমূলক হ'লে হাতে লিখে পূজামণ্ডপের দেওয়ালে বা দরজায় আঠা দিয়ে সেঁটে দি। "দেবাসুর সংগ্রামের হয়েছে সময়" ; বা "মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ জননী পায়ে ধরি ধ'রো না ধ'রো না।" এই ধরনের লেখা সেগুলি। সেই সময় কাজী সাহেবের বিদ্রোহী কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। সেবার বৈশাখে—(১৯২২।২৩ হবে বোধ করি) "তোরা সব জয়ধ্বনি কর"—কবিতাটি প্রবাসীতে বেরিয়েছিল ; পড়ে বুকের মধ্যে ঝড়ের স্পর্শ অনুভব করেছি। এই সময়ই আমাদের গ্রামে শখের মঞ্চের অভিনয় উপলক্ষ্যে এসেছিলেন স্বর্গত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তাঁর কাছ থেকে কোন বই বা কোন পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পড়তে পাই। তারপর শুনি সভা ও সমিতিতে গান—শিকলভাঙার গান, জীবনপণের গান—ক্রুদ্ধবক্ষ জীবনের গান। ভূমিকম্পের যে একটা গর্জন আছে, বজ্রপাতের হিংস্র-চীৎকারের মত যে হুঙ্কার আছে—তারই সুর—তারই উত্তাপ তারই বীর্যবত্তা ছিল সে গানে।

সে কালে বাংলার যৌবনের রূপ একটি মাত্র রূপ ;—সে রূপ বিদ্রোহী রূপ বিপ্লবী রূপ। সেই ১৯২২ সাল। ২৩ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত, বাংলার এই যৌবন সম্পর্কে যখনই মনে মনে ধারণা করতে চেয়েছি—তখনই মনে পড়েছে একসঙ্গে দুটি নাম—প্রথম নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—এবং তাঁর ঠিক পিছনেই তাঁর ছায়ার মত দেখতে পেতাম আরও এক নামীয় জনকে—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। আরও একজনকে মধ্যে মধ্যে মনে হ'ত—তিনি সাধক ও গায়ক দিলীপকুমার রায়। তবে রায় মহাশয় স'রে স'রে গেছেন নিজে থেকেই। কাজী সাহেবও স'রে এসেছেন। ওইখানে দাঁড়িয়ে দেশের

গান গাইতে গিয়ে তাঁর জীবনে খুলে গিয়েছিল দেশাতীত ও কালাতীত চিরন্তন সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রের বা রাজ্যের সিংহ-দ্বার। সুরের রাজ্যে এসে সুরের সুরধুনীর প্রবাহে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

একদিন বাংলাদেশের মানুষ হঠাৎ শুনল নতুন সুর নতুন গান। "কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজায় বনে।" পাগল হয়ে গেল মাতাল হয়ে গেছিল এই সুরের মাদকতায় সেদিন বাঙলা দিন। তারপরই শুনেছি "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।" আশ্চর্য। স্বল্প কয়েকটা বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে বিদ্যমান—তখন কাজী সাহেব এলেন। এলেন কালবৈশাখী বা অকাল বৈশাখীর মত।

অথবা আগ্নেয়গিরি। হঠাৎ একদিন বাংলাদেশের যুবকজীবনে সঞ্চিত যে অগ্নিজ্বালা ও জীবন-ধাতু অবরুদ্ধ হয়ে শতাব্দী কাল ধ'রে টগবগ ক'রে ফুটছিল—তা অবরুদ্ধ মুখটাকে ফাটিয়ে আকাশ-লোকের দিকে অগ্নিদীপ্ত ও শিখা-প্রসারিত ক'রে দিল। কাজী সাহেবের প্রেমের গান প্রকৃতির গানেও আশ্চর্য মাদকতা। বিস্ময়কর প্যাশনে যেন আচ্ছন্ন ক'রে নাচন জাগায় যুবকদের জীবনে। আবার বাংলাদেশের মাটির বুকে তিনিই এই বিংশ শতাব্দীতে সাধক রামপ্রসাদের উত্তর-সূরী।

কাজী সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যৎসামান্য। অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪০ সালে ঠিক পূজার পর তিনি হঠাৎ একদিন রাত্রে—হাসির গানের গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারকে সঙ্গে ক'রে আমার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার আগে কাজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্যই হয় নি। তিনি আমাদের ওখানে স্থানীয় একটি দেবস্থলে বাতের ওষুধের জন্য গিছলেন (তাঁর স্ত্রীর জন্য)। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম তাঁরা আসছেন—একদিন আমার বাড়িতে থাকবেন। সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একটি শিশুপুত্র মারা গিছল দুপুরবেলায়। রাত্রে এলেন। এবং একান্ত অপ্রতিভ বিষণ্ণতার মধ্যেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। পরদিন কাজী সাহেব আমাদের গ্রামের "ফুল্লরা" দেবীর (মহাপীঠ রূপে

খ্যাত) স্থানে গেলেন। এবং মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের উপর পদ্মাসন হয়ে বসে প্রাণায়াম সহযোগে যে জপ ক'রেছিলেন তা দেখে এ কথা বলব যে এই ব্যক্তি এক আশ্চর্য চরিত্র ব্যক্তি; তাঁর অন্তরের যে পিপাসা, যে-পিপাসা যৌবনপিপাসায় মাতাল করা গজল গানে ব্যক্ত হয়েছে—সেই পিপাসাই অন্তরের পিপাসা হয়ে ব্যক্ত হয়েছে এই শ্যামাসঙ্গীতে এবং সাধারণ জনের দৃষ্টির অগোচর সাধনায়। যাঁরা তাঁর অতি সন্নিকটের মানুষ—তাঁরা এই দিকটিকে আড়াল দিয়ে এড়িয়ে চলেন—এই পরমাত্মিক গভীর হৃদয়ের তৃষ্ণা তাঁদের নাই, তাই এই দিকটার কথা অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এদিকটিতে কেউ যদি তাঁর সঙ্গী সাথী থাকতেন তবে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী নজরুল, সাম্যবাদী নজরুল, প্রেমের কবি নজরুল—এই তুই রূপের নজরুলের সঙ্গে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার তৃষিত নজরুলের বিচিত্র রূপটি প্রকাশিত হ'ত। তা হয় নি।

উপমায় ঝড়ের চেয়েও আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই যেন নজরুল ইসলামের বেশী মিল আছে। সেই জ্যামিতিক ত্রিভুজের মিলের মত মিল যার। কবির জীবনের বহ্নি-তপস্যা আগ্নেয়গিরির মতই একদা বহ্নিমান হয়ে উঠল; নিজেকে নিঃশেষে রিক্ত করে জীবনের সব কিছুকে উদ্গীরণ ক'রে ঢেলে দিল মানুষের বুকে বুকে। তারপর একদা স্তব্ধ হয়ে গেল। নিঃশেষিত বহ্নি নিঃশেষিত জীবন-ধাতু স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মতই তিনি নির্বাক স্তব্ধ হয়ে একটি বিষণ্ণ অথচ সাধকোচিত মহিমায় আমাদের মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন। নজরুল ইসলামের এই স্তব্ধতার মধ্যে একটি প্রসন্নতা আছে, সেটি নির্বোধের হতাশা-জনক ভঙ্গি নয়—এটা যে যাবেন তিনিই অনুভব করবেন।

এই জীবনকে বলা উচিত মহাজীবন। কারণ এর মধ্যে লুকানো রয়েছে একটি সনাতন তপস্যা। সে তপস্যা কবিযশ নয়, সে তপস্যা যৌবন রূপ রস সঙ্গীত সমৃদ্ধ কয়েকটা দিনরাত্রির খেলা নয়, সে তপস্যা ঈশ্বরকে জানার তপস্যা। সৃষ্টির আদিম প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে তপস্যা—এ তপস্যা তাই।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি নজরুলের ধ্যানে দেশ-মাতৃকা ও জগন্মাতা

সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যে সব কবি বা সাহিত্যিক সহৃদয় পাঠকবর্গের মুগ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যাঁদের প্রথম যুগের রচনায়ই একটা সুস্পষ্ট পরিণতি ও পরিপক্কতার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের ভেতরেও বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, জগন্মাতার বিদ্রোহী ও অভিমানী সন্তান, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত, যুগ-প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

আমাদের এই বাংলা দেশে শক্তি-সাধনা, বৈষ্ণবীয় সাধনা ও আউল-বাউল প্রভৃতি মরমিয়া সাধনার ধারা,—এই ত্রিধারার মিলনে এক নতুন ত্রিবেণী সঙ্গম রচিত হয়েছে। নজরুলের কবি-মানস যেমন একদিকে বাঙালী সাধনার ভাব-রসে পরিপুষ্ট হয়েছে, তেমনি তাঁর যুগ-সচেতন মনে একালের নানা চিন্তাধারাও সংহত হয়েছে। অর্ককান্ত* বা আতস কাঁচে যখন সূর্যের রশ্মিগুলি কেন্দ্রীভূত (focussed) হয়, তখন উহা দীপ্যমান অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুলের কবি-মানসকেও আতস কাচের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল বলেছেন—

> 'মম এক-হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
> আর হাতে রণ-তূর্য।'

কবি নজরুলের মধ্যেও আমরা প্রধানত এই দ্বৈত সত্তাই লক্ষ্য করি। যেখানে নজরুল নিপীড়িত জনগণের বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, যেখানে তিনি পুঞ্জীভূত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, যেখানে তিনি বিধাতার 'তথাকথিত মঙ্গলময় বিধানের' কাছে নতিস্বীকার করেন নি, বরং বিধির বিধানকে চূর্ণ করে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র রচনা করতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি জাতির মনে নব

*যোগশাস্ত্রে 'অর্ককান্ত' বলতে বোঝায় আতস কাচ বা Convex Lens.

চেতনা সঞ্চারের জন্যে, জাতিকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যে তূর্যনিনাদ করেছেন। যে কালবৈশাখীর ঝড়ের ধ্বংসলীলা দর্শন করে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—

'আনন্দে আতঙ্কে মিশি ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।'

সেই কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যেই নজরুল নূতনের কেতন উড্ডীয়মান হতে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলও বিশ্বাস করেছেন, মানুষের ঐতিহ্যে যা শাশ্বত, যা সনাতন, যা শুভ, যা ধ্রুব তাকে স্বীকৃতিদান করতেই হবে, কিন্তু যা জীর্ণ, যা অকল্যাণকর, যা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত, যা মানবতা-বিরোধী তারই ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুনের হর্ম্য রচিত হবে। বিধাতা প্রত্যেক মানুষকে তাঁর ন্যায়দণ্ড অর্পণ করেছেন, তাই অন্যায় যত প্রবল বা প্রচণ্ডই হোক, তার বিরুদ্ধে উন্নত শিরে দাঁড়াতে হবে। তাই বৈদিক ঋষিও প্রার্থনা করেছেন—'হে মন্যুস্বরূপণ* তুমি আমায় অন্যায়দ্রোহী করো।' আর যোশেফ ম্যাটসিনি বলেছেন—'Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betray your duty?'

তাই 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

'মহা- বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

নজরুল মনে-প্রাণে শক্তি-সাধক, তাই তিনি সর্বপ্রকার দৈন্যকে বিসর্জন দিয়ে, সর্ববিধ ভয় ও ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে

*মন্যুকে ইংরেজিতে বলা হয় Righteous indignation.

উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়েছেন, স্বদেশী যুগের কবির মতো তিনিও বিশ্বাস করেছেন—

'শক্তি পূজা কথার কথা না (শ্যামা),
যদি কথার কথা হোতো চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হোতো না।'

আবার যখন তিনি করাল-বদনা, মুক্তকেশী, দিগ্বসনা জগন্মাতার ধ্যানে তন্ময় হয়েছেন, যখন তিনি আত্মসমাহিত হয়ে শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করেছেন, বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর তত্ত্ব-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন ('দেবীস্তুতি' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), তখন তিনি প্রধানত বাংলার শক্তি-সাধকগণের ভাবধারার উত্তরাধিকারী। (যদিও তাঁর ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গি স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র।)

আবার এ কথাও সত্য যে, নজরুলের চিন্তাধারার ভেতর গঙ্গা-যমুনাধারার মতো ভারতীয় ও ঐস্লামিক ঐতিহ্যের মিলন ঘটেছে। যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল বলছেন—

'আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,
আমি পিনাকপাণির ডমরু ত্রিশূল,
ধর্মরাজের দণ্ড' ইত্যাদি

আবার, একথাও স্বীকার্য যে নজরুল বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনারও উত্তরাধিকারী। কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদকারী শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখেছেন সাধুদের পরিত্রাতা, দুষ্কৃতদের বিনাশকারী ধর্মসংস্থাপকরূপে, তিনি গীতার বাণীর ভাষ্য রচনা করেছেন 'সব্যসাচী' কবিতায়—

'যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহা-সেনাপতি,
যুগে যুগে হন শ্রীভগবান যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্‌গাতা
ন্যায় পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা
আসিব দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি।'

আবার কখনো কখনো বৃন্দাবন-বিহারী অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ

তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, অন্তরের মধ্যে শ্যামের বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে তিনি 'আনমনা উদাসী' হয়েছেন। কখনো বা তাঁর গানে বাউলের সীমাহীন বেদনা ও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, নজরুলের কবি-মানসে বাংলার সাধনার তিনটি ধারা এসে অবিরোধে মিলিত হয়েছে।

মনে পড়ে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি মফঃস্বল শহরে (ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জে) একটি সাহিত্য-সম্মেলনে কাজী সাহেবকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম। দেখেছিলাম সে 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' পুরুষটিকে, যার সম্পর্কে মহাকবি কালিদাসের ভাষায় সত্যিই বলা চলে—'আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ', ক্ষাত্রধর্ম যেন এঁর মধ্যে আত্মকর্মক্ষম দেহকে আশ্রয় করেছে। মুখ-মণ্ডলে দুর্জয় সঙ্কল্প ও বলিষ্ঠ পৌরুষের ছাপ। কথাবার্তায়, আবৃত্তি ও গানে উচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্য যেন উপচে পড়ছে, সাহিত্য-সম্মেলনে বা সাহিত্যিক মজলিশে এবং সম্মেলনের বাইরেও দেখেছি, কবিকে স্ব-রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ জানালে তিনি দশটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, একটি গান গাইতে অনুরোধ করলে গানের মালা গেঁথে চলেছেন। কোনো তরুণ বন্ধুকে বিষাদগ্রস্ত বা চিন্তান্বিত দেখলে বলেছেন—'তুমি কি মা-মরার টেলিগ্রাম পেয়েছো ?'

কাজী নজরুল একদিন বলেছেন—'আমার চিন্তায় বেদান্তদর্শনের প্রভাব রয়েছে। বেদান্ত বলেন, জীব মাত্রেই ব্রহ্ম। মানুষ যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানতে পারে, তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়।' স্বামীজীও বলেছেন—বেদান্ত আমাদিগকে আত্মার মহিমা সম্পর্কে সচেতন করে, আর আমাদের ভেতর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে। বাস্তবিক, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে বেদান্তদর্শনেরও প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বিদ্রোহী বলছেন—

'আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !'

অবশ্য, এখানে 'তুরীয়ানন্দ' বলতে সমাধির প্রশান্ত আনন্দকে বোঝাচ্ছে না, কবি কথাটির অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন।

মানুষের সকল চিন্তাধারাই বোধ হয় পুরাতন, সেই পুরাতন চিন্তা-ধারাই নানা দেশে নানা যুগে বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি লাভ করে। তাই ভারতের বৈদিক ঋষি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে বলছেন—

'পরাক্রমের মূর্তি আমি,
সর্বশ্রেষ্ঠ নামে আমায় জানে সবাই ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন ওড়াতে'।

(মনস্বী বিনয় সরকারের অনুবাদ)

ঋষি-কবির এই উপলব্ধি তো কোনো বিশেষ কালের নয়, তাই একালের বিদ্রোহী কবিও তাঁরই ভাবধারার উত্তরাধিকারী।

কথাপ্রসঙ্গে নজরুল বলেছেন—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা চিরদিনই আমায় প্রেরণা দিয়েছে, বলতে গেলে তিনিই আমার সাহিত্যগুরু। সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম-লগ্নে প্রবল ঝড় বইতে থাকে, তাই তাঁর 'ডাকনাম' ছিল 'ঝড়ো'। আবার সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণ-কালেও প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি হয়। এসব কথা কবি নজরুলের কাছে শুনেছি। 'সত্য-কবি' ও 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি' নামক দু'টি কবিতায় নজরুল 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ছন্দ-পাগল', 'তীর্থরেণু', 'তীর্থসলিল,' 'কুহু ও কেকা', 'বেণু ও বীণা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রশস্তি গান করেছেন, আবার অন্যায়-দ্রোহী, মানবতার পূজারী মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিও কবি-অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি নজরুলের কোনো কোনো বিষয়ে ভাব-সাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়েই শব্দচয়ন-কুশলী কবি, এঁরা দু'জনেই ফারসী, আরবী প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে বঙ্গবাণীকে সম্পন্ন করেছেন। কবি নজরুলকে বলতে শুনেছি—'প্রত্যেক ভাষায়ই এমন বিশিষ্ট ভাব-প্রকাশক শব্দ থাকে অন্য ভাষায় যার অনুবাদ করা চলে না। যেমন ফারসী 'দরদ' শব্দটির অন্তর্নিহিত ভাব 'সহানুভূতি' 'সমবেদনা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এ কথাটি

যে সত্য, তা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়েই শব্দচিত্রাঙ্কনে ও শব্দসঙ্গীত-সৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং বঙ্গবাণীর কণ্ঠে নতুন ছন্দ ও সুরের মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রধানত বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তাঁর প্রকাশভঙ্গিও সংযত, আর নজরুলের কবিতা প্রবল হৃদয়াবেগ থেকে উৎসারিত এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সত্যেন্দ্রনাথের 'জাতির পাঁতি', 'সেবাসাম' প্রভৃতি কবিতাগুলির সঙ্গে নজরুলের 'সাম্যবাদী', 'জাতের বজ্জাতি' প্রভৃতি কবিতার তুলনা করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছেলের দল' কবিতাটির সঙ্গে নজরুলের 'ছাত্রদলের গান' কবিতাটি তুলনীয়। নজরুলের 'হিন্দু-মুস্লিম যুদ্ধ', 'প্যাক্‌ট' প্রভৃতি কবিতা বিদ্রূপাত্মক রচনার নিদর্শন। 'সাম্যবাদী' নামক দীর্ঘ কবিতাটির মধ্যেও স্থানে স্থানে ব্যঙ্গদ্রিূপের অভাব নাই। 'নারী' সম্পর্কে কবি বলছেন—

> 'বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
> বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
> অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।'

'সাম্যবাদী' কবিতায় বিদ্রোহী নজরুলেরই আর একটি রূপ আমাদের চোখে পড়ে।

আমাদের দেশে প্রতিভাকে বলা হয়েছে 'নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি'। যেখানে নজরুল নিজের পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে এবং আত্মসমাহিত হয়ে কাব্যসাধনা করেছেন, সেখানে তাঁর এই প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা তাঁর 'সিন্ধু' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সকলেই সিন্ধু সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু নজরুলের 'সিন্ধু' কবিতাটি পূর্বগামী কবিদের প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত।

নজরুলের কবি-মানসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চিত্তরঞ্জনের প্রবল ব্যক্তিত্ব, অজেয় পৌরুষ, অনলস

কর্মসাধনা, তীব্র স্বদেশ-প্রেম, ও অতুলন আত্মত্যাগ নজরুলের অন্তরে জাগিয়েছে সীমাহীন শ্রদ্ধা। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর 'ইন্দ্রপতন' কবিতায় কবি লিখেছেন—

'লক্ষ্মী দানিল সোনার পাগড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশি,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দারমালা, মানব মাখালো ধূলি।'

নজরুলের যে সকল কবিতা ও গান বাংলার তরুণদের মনে দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচন ও শোষণমুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছে, সেগুলির উৎস হচ্ছে—স্বদেশপ্রেম ও লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি সহানুভূতি। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে স্বদেশপ্রেমের যে মন্ত্র দান করেছেন, সেই মন্ত্রে সিদ্ধ হয়ে বহু সাধক মৃন্ময়ী দেশমাতৃকার মধ্যে চিন্ময়ী জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মন্ত্রচৈতন্যের ফলে কবি নজরুলও দেশমাতৃকার মধ্যে চৈতন্যময়ীকে উপলব্ধি করলেন, তারপর শৈব সাধক যেমন সংকীর্ণ স্বদেশপ্রেমকে 'উদার' বিশ্বপ্রেমের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—

'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥'

কবি নজরুলও তেমনি দেশমাতৃকার আরাধনাকে বিশ্বজননীর উপাসনার ভেতর ডুবিয়ে দিয়ে যেন সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদের মতো গেয়ে উঠলেন—

'মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।'

এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জননীই আবার কবির দেহভাণ্ডবিলাসিনী। সংস্কৃতে 'মাতৃকা' শব্দের অর্থ 'ছোট মা' আর এই শব্দ থেকেই বাংলায়

'মাইয়া' ও 'মেয়ে' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। 'দেবীস্তুতি'-রচয়িতা নজরুল বিশ্বমাতার (বড়ো মার) আরাধনার ভেতর দেশমাতৃকার (ছোট মায়ের) সেবার্চনাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

'দেবীস্তুতি'তে নজরুল মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবসপ্তসতীর ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতির রূপক ব্যাখ্যা করেছেন, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর প্রচলিত ব্যাখ্যাও তিনি গ্রহণ করেন নি। (ভারতীয় তান্ত্রিক সাধকের দৃষ্টিতে মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মী হচ্ছেন যথাক্রমে জগন্মাতার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।) অবশ্য, শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিশদ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে 'সাধন-সমর' নামক গ্রন্থমালায়। তথাপি 'দেবস্তুতি' নামক গ্রন্থে সাধক নজরুলের একটি বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে।

সাধক নজরুলের 'দেবস্তুতি' থেকে আমরা একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

'যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই পরমাত্মা। অগ্নি এবং তাহার দাহিকা-শক্তি যেমন অভিন্ন, জল ও তাহার শীতলতা যেমন অভিন্ন, পরমাত্মা ও আদ্যাশক্তিও তেমনি অভিন্ন।

'আদি-অন্ত-হীন কালের বক্ষে লীলা করেন বলিয়া তিনি কালী। বিশ্বের সকল কিছুকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণা। তিনিই শিব, তিনিই রাম, তিনিই হ্লাদিনী শক্তি রাধা। বিশ্বের সকল জড়-জীব বিভিন্ন নামে তাঁহাকেই উপাসনা করে।'

ভারতীয় সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য যে বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্যানুভূতি, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলও সে সত্য উপলব্ধি করেছেন। শিবমহিম্ন স্তবে এই অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে—

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥'

আমাদের দেশ ও জাতির পরম দুর্ভাগ্য, কবি-কণ্ঠ দীর্ঘকাল স্তব্ধ, ভাষাহীন। যিনি এই দীর্ঘকাল বঙ্গবাণীকে অকৃপণ দানে সম্পন্ন করতে পারতেন, দুর্দিনে দেশ ও জাতিকে কল্যাণের পথের নির্দেশ

দিতে পারতেন, তাঁর এই নীরবতা গভীর বেদনাদায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটাই বোধ হয় কবি নজরুলের জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি। গীতাধ্যানের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকের প্রথম চরণ থেকে আমরা দু' রকমের অর্থ পেয়ে থাকি। 'মূকং করোতি বাচালং', অর্থাৎ যাঁর কৃপা মূককে বাচাল বা বাগ্মী করে অথবা যাঁর কৃপা বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন মানুষকে বাকৃশক্তিহীন করে, (মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত ভাষায় 'বাচাল' কথাটির অর্থ 'বাগ্মী', 'বহুভাষী' নয়।) যে বিধি বা বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে মূক মুখর হয়, তাঁরই বিধানেই হয়তো মুখর ব্যক্তির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে আমাদের সান্ত্বনা এই যে, নজরুলের সাহিত্যসাধনা দীর্ঘকালব্যাপী না হলেও তাঁর দানের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। আমরা তাঁর জন্মদিনে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমরা যদি তাঁর রচনা-সম্ভার থেকে নতুন করে মনুষ্যত্ব প্রেরণা লাভ করি এবং যুগ-সঙ্কট হতে পরিত্রাণ-লাভের চেষ্টা পাই, তবেই আমাদের এই শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে।

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আলোর বাণীবাহ নজরুল

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বন্ধুবরেষু,

আমাকে কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছ। কিন্তু বড় বেশি বিলম্বে। অপিচ, কলকাতায় আসতে না আসতে আমি এমন গতির ঘূর্ণির মধ্যে প'ড়ে যাই যে রামপ্রসাদের কথা মনে প'ড়ে যায়ঃ

(তুমি) দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলীর মূলে।

কবিসাধক একথা বলেছিলেন কারণ এ-মূলাধারে পৌঁছলে মনপ্রাণ শান্তিতন্ময় হয়ে ধন্য হয়। কিন্তু আমি আজো এ-নিঃশব্দলোকে পৌঁছই নি—তাই তুমি "টূলেট" হওয়া সত্ত্বেও বসেছি যা পারি দুটো কথা বলতে কাজীর সম্বন্ধে।

একটা মুশকিল এই যে, কাজী সম্বন্ধে আমি লিখেছি অনেক কিছুই। আমার "ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ" প্রবন্ধাবলীতে ছাপা হচ্ছে। তাই হয়ত অনেক কথারই পুনরুক্তি হবে। হোক। কাজী আমার এত প্রিয় ছিল যে তার সম্বন্ধে লিখতে আমন্ত্রিত হয়েও সাড়া না দিলে মন আমাকে ধম্‌কাবে।

তুমি জীবনসংগ্রামের ছবি এঁকে নাম করেছ। তাই তুমি জানো হাড়ে হাড়েই যে, জীবনে প্রতি পদে হানা দেয় হাজারো স্বতোবিরোধ—সাহেব পুরাণে যাদের অভিধা—প্যারাডক্স। বিখ্যাত ভজনসাধক, তুকড়াদাস লিখেছিলেন এ-স্বভাববিরোধের কথা :

অজব তমাশা তেরা শ্যামল ! অজব তমাশা তেরা
তু দুনিয়ামে দুনিয়া তুঝমে, উলট পালটসে ফেরা।

অর্থাৎ

সৃষ্টি তোমার অপরূপ শ্যাম, অপরূপ লীলা এ কি !
তুমিও জগতে জগৎও তোমাতে ওলট পালট দেখি !

এইটুকু ভূমিকা গেয়ে নারায়ণং নমস্কৃত্য শুরু করি।

সবদেশেই লোকে জানে তথা মানে যে, জীবনলীলার একটি বিচিত্র প্যারাডক্স হ'ল এই যে, কবিতার আদর গদ্যের তুলনায় অনেক কম হ'লেও মহাকালের দরবারে শিরোপা পান সব আগে কবিই, প্রাঞ্জলতম গদ্যেরও স্থান রসোত্তীর্ণ কাব্যের পরে। রবীন্দ্রনাথও উঠতে বসতে বলতেন—সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস বর্গীয় রচনা নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান কবিতা, এবং কাব্য-নন্দনেও তিনি পারিজাত ফুটিয়েছেন গানে।

কিন্তু তবু মানুষ কবিতায় তেমন সাড়া দেয় না। মাসিক পত্রিকাদিতে কবিতা (বা গান) ছাপা হয় বটে, কেবল প্রায়ই শূন্য স্থানের ফাঁকে। পাঠকেরা সবচেয়ে বেশি সাড়া দেয় গল্প ও উপন্যাসেই বটে।

স্বভাবকবি যাঁরা তাঁরা একথা জানেন কিন্তু তবু কবিতা বা গান রচনা না ক'রে থাকতে পারে না। অন্য দেশে বড় কবিরা সচরাচর

গান বাঁধেন না, কিন্তু বাংলা হ'ল গানের জন্মভূমি, তাই এদেশে গানের ফসল ফলে তেমনি সহজে যেমন সহজে বসন্তে বয় মলয়, বর্ষায় নামে জলধারা। স্বভাবকবি কাজী ছিল এই মলয় হাওয়া তথা নির্ঝরণের একটি প্রদীপ্ত নমুনা। কবিতা ও গান তার কলমে ঝরত অশ্রান্ত প্রবাহে। তার এই অসামান্য সহজপটুতার ফলে তার ক্ষতি কম হয় নি—নানা আবদেরে ভক্তের বায়নায় সে এমন সব কবিতা দুহাতে বিলিয়ে গেছে যাদের কোনোমতেই কবিতা বলা চলে না। কিন্তু স্বভাবে সে ছিল বদান্য, তাই কাউকেই "না" বলতে পারত না। আমি এতে ক্ষুণ্ণ হতাম, কিন্তু তারপরে যেই সে রসোত্তীর্ণ গান বাঁধত মন আমার সান্ত্বনা পেত অ্যাডনিসের ভূমিকায় শেলির একটি প্রখ্যাত উক্তি স্মরণ ক'রে যে, কোনো কবি নীরস কবিতা লিখলে তাঁকে নিন্দা করা হবে সময়ের ও শক্তির অপব্যয়—রসিকদের অনাদরই হবে তাঁর সেরা শাস্তি। কাজীর কবিতা বা গানের মধ্যেও যেগুলি ফুলের মতন ফুটে উঠে রসিক চিত্তকে তার সৌরভে ছুলিয়ে তুলত সেইগুলি দিয়েই তার কবিত্বের মূল্যায়ন হবে, যেগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি সেগুলি তো যথাকালে ঝ'রে যাবেই যাবে। ইংরাজীতে বলে : The greatness of a man is the greatness of his greatest moments. কবির রচনাকেও এই নিকষেই কষতে হবে, অর্থাৎ তাঁর সেরা কবিতাই হবে আলোচ্য ও উপভোগ্য, যেগুলি নিটোল সৃষ্টি হয় নি সেগুলিকে সবাই পাশ কাটিয়ে যাবেন নীরস ব'লে, তাই সেগুলিকে নিয়ে কেন মিথ্যে মাথা বকানো ?

তাই কাজীর সার্থক কবিতার—বিশেষ করে গানের সম্বন্ধেই যা পারি আমার "স্মৃতিচারণী" ভঙ্গিতে বলি তোমার আমন্ত্রণে। অবহিত হও।

কাজী ছিল শুধু আমার প্রিয় বন্ধু নয়, প্রায় ছোট ভাইয়ের মত অন্তরঙ্গ আত্মীয়। তার সঙ্গে যতই মিশেছি ততই তাকে আরো বেশি ভালোবেসেছি। এমন দিলদরিয়া, স্নেহশীল, বন্ধুবৎসল, সদাশয়, নিত্যানন্দ প্রাণোচ্ছল মানুষ আমি বেশি দেখি নি—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে যেখানে মানুষ অনেক সময়েই ঝিমিয়ে পড়ে যৌবন না

পেরুতেই। কাজীকে দেখে আমাদের প্রায়ই মনে হ'ত রবীন্দ্রনাথের চির সবুজের গান :

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী।

জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

বলতাম ওকে : "কাজী, তুমি কোনোদিনই বুড়ো হবে না, তোমার মাথার ঝাঁকড়া চুলে পাক ধরলেও মন তোমার চলবে যৌবনেরি ঘোড়শোয়ার হয়ে।" সে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলত : "তাই তো আমি আপনার ছোট ভাই বনতে পেরেছি দিলীপদা, হা হা হা।" এক কথায়, সনাতন গতানুগতিকতার ও অকালবার্ধক্যের সে ছিল যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। সে যখন হো হো ক'রে ছাদফাটা হাসি হাসত তখন তার সে-উল্লাসের উলুধ্বনিতে গম্ভীরাননেরাও সাড়া না দিয়ে পারতেন না—সুকুমার রায়ের ভাষায়, কাজী কোনোদিনই নাম লেখায় নি "রামগরুড়ের ছানা-"দের দলে—"হাসতে যাদের মানা।"

উচ্চশিক্ষায় সে পোক্ত হয়ে ওঠে নি, তাই মামুলী দেঁতো হাসির সুশীল বিধিবিধানকে সে পাশ কাটিয়ে যেত তেমনি সহজে যেমন সহজে মোটরযান পাশ কাটিয়ে যায় গোযানকে। সহজ সরল দিলখোলা এ-মানুষটি দুদিনেই আমার "দৈলিপী" আসরের শুধু যে একজন প্রধান সভাসদ নয়—হয়ে উঠেছিল প্রায় মধ্যমণির কাছাকাছি। আমার নানা চ্যারিটি গানেই সে এসে তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে কী চমৎকারই যে গাইত তার নানা প্রাণোদ্বেল গান! সুভাষ সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিল এমনি এক আসরে তার মুখে শুনে :

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!"

হুঁশিয়ার-এর মতন গদ্যাত্মক বিশেষণকে যে বীর্যভঙ্গিতে এভাবে কাব্যপাংক্তেয় করা যেতে পারে কে ভেবেছিল?

এ-গানটির আর একটি চরণ অপূর্ব, অতুলনীয় :

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছে যারা জীবনের জয়গান।"

এ-চরণটি বাংলা ভাষায় উদ্ধৃতির পদবী পেয়েছে তার স্বাধিকারের জোরে।

আর একটি গান—এটিও শুনতে শুনতে সুভাষের গৌরানন রাঙা হয়ে উঠত :

"শিকলপরা ছল মোদের এই শিকলপরা ছল।
শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল।"

দুঃখের বিষয়, আমার হাতের কাছে ওর কবিতার একটি বইও নেই। তবে মনে হয় এ-গানটির একটি স্তবকে ছিল :

"ক্রন্দন নয়, বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা,
(সে যে) মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা,
(এই) লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
(মোদের) অস্থি দিয়েই আবার দেশে জ্বলবে বজ্রানল....
(আমরা) আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়
(আমরা) ফাঁসি দিয়ে আনব হাসি মৃত্যুঞ্জয়ের ফল।"

শুনতে না শুনতে আমাদের মন চেতিয়ে উঠত। সুভাষ সহজে উচ্ছ্বসিত হবার পাত্র নয়, কিন্তু সেও যেন শিউরে উঠত।

অজস্র ভক্তদের দাবি মেটাতে যত্রতত্র গান গেয়ে কাজীর স্বরভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু এমনিই ছিল ওর প্রাণশক্তি যে ওর ভাঙা গলায় গাওয়া গানেও আমাদের মনেপ্রাণে আগুন জ্ব'লে উঠত—ও নিজে মেতে সবাইকেই মাতিয়ে তুলত ওর তেজস্বিতার জাদুবলে।

আর একটি গান ও প্রায়ই গাইত—মহোল্লাসে আমাদের মনে উল্লাস জাগিয়ে :

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ক মোয়া।

এর আর একটি চরণ—সেটি কি ভুলবার?

(তোরা) ছেলের মুখে থুতু দিয়ে মা-র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া!

অনেকে ওর "বিদ্রোহী" কবিতাটিকে মান দিয়ে থাকেন বাংলা ভাষায় বীররসের একটি সেরা কবিতা ব'লে। কিন্তু এ-কবিতাটির মধ্যে নানা অনবদ্য চরণ থাকলেও সব জড়িয়ে এর rhetorical বাগ্মিতার আমেজ আমার মনকে এত বেশি আঘাত করত যে, আমি কোনোদিনই এই বহুস্তুত কবিতাটির অনুরাগী হ'তে পারি নি।

আমার মন মানতে পারত না যে, যা-ই উদ্দাম অধীর ফেনিল তা-ই প্রগতিশীল। ওর স্বদেশী গানে যে-ওজস্বিতা ঝল্‌কে উঠত সে ছিল খাঁটি সোনা। কিন্তু ওর এ-ধরনের নানা বীর্যভঙ্গিম কবিতার মধ্যে rhetoric ও rhapsodyর খাদ মিশোন থাকার দরুন এ-জাতীয় কবিতাকে ওর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ বলে মনে করা চলে না।

ওর নানা কবিতা সুন্দর হ'লেও ওর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে ওর গানেই বলব। এ কথায় ওর অনুরাগীদের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথও কি বলেন নি যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর গান? কাজীর সম্বন্ধেও ঐ কথা। আর সেইজন্যেই আমার মনের সঙ্গে ওর মনের সুর পুরোপুরি মিলত এসে এই গানেরই অন্দরমহলে, কবিতার রংমহলে নয়। তাই এবার সংক্ষেপে বলি ওর গানের কথা।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন গানের এক দিক্‌পাল—ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা কীর্তন বাউল ও বহুভঙ্গিম প্রেমের গানে স্বদেশী গানে তাঁর দান যে অসামান্য আজ সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর গানে ঠুংরির চাল মেলে না—পেলবতা ও সৌকুমার্যের সমন্বয়ে।

বাংলায় এ-চাল প্রথমে আনেন অতুলপ্রসাদ। তাঁর সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বহু আলোচনা করেছি। কাজীর সম্বন্ধেও করেছি আমার দুটি নিবন্ধে। তাতে দেখাতে চেষ্টা করেছি কী ভাবে আমাদের বাংলা গানকে ও সমৃদ্ধ করে গেছে গজলের প্রেমের দুলকি চালে। এর পরে ও ঠুংরিতেও অনেকগুলি গান বাঁধে অতুলপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে। কিন্তু সে-গানগুলি চমৎকার হ'লেও গানে ওর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল সবচেয়ে বেশি ওর বাংলা গজলেই বলব। আমার বিশেষ প্রিয় ছিল ওর একটি গজল যেটি ভ্রাম্যমাণ হয়ে সর্বত্র গেয়ে আমি বহু শ্রোতাকেই সচকিত ক'রে তুলেছিলাম :

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল।"

এ-গানটি একদা প্রায় আমার "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"-র মতনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই গানটির জন্যেই ও আমাকে পরে ওর গজল গীতিগুচ্ছ "বুলবুল" উৎসর্গ করে।

ওর আর একটি গান আমি গাইতাম—আমার গানের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনকে শিখিয়েও ছিলাম :

"আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী !"

এ-গানটির একটি চরণে আছে একটি অপরূপ উপমা :

"হুঁ হুঁ হায় চায় বিষাদে, মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণাজলধি।"

ওর আর একটি মনোজ্ঞ গজল :

চেও না আর চেও না সুনয়না, এ-নয়ন পানে
জানিতে নেই তো বাকি সই, ও আঁখি কী জাদু জানে।

মিলেও ওর ছিল অসামান্য কৃতিত্ব। ওর একটি শ্লোক মনে পড়ে :

থামিয়াছে বারিদের গুরু গরজন
নামিয়াছে নারীদের ভুরু তরজন।

হাতের কাছে ওর বই থাকলে হয়ত আরো অনেক কিছু লিখে ফেলতাম ফুরসত না থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু তাতে তুমি নিশ্চয়ই ভীত হ'তে। তাই এবার উপসংহার পর্বে নামি।

মনে পড়ে ওর কবিতায় সহজপটুতার কথা। একবার ওকে ধরলাম : "কাজী ভাই, আজ আমাকে অমুক সভায় গজল গাইতে হবে। তুমি লিখে দাও একটি নয়া গজল।"

ও একগাল হেসে বলল : "এ আর বেশি কথা কী দিলীপদা ?" ব'লেই লিখে গেল একটানা আমার খাতায় (এ-খাতাটি আমার কাছে এখনো আছে ওর করলিপিতে মহার্ঘ হয়ে)

"এত জল ও কাজল চোখে
পাষাণী আনলে বলো কে ?"

এ-গানটি ও গাইত হিন্দুস্থানী লোকসঙ্গীতের ঢঙে—কাজরি চালে —পাহাড়ী রাগের আমেজ এনে। অতুলপ্রসাদ গুণে মুগ্ধ হয়ে এর জুড়ি গান করেন তাঁর বিখ্যাত :

"জল বলে চল্ মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল হবে না বিফল।"

এর পরেই ও ভক্তিসঙ্গীতের দিকে ঝোঁকে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ওর জীবনে শনির আবির্ভাব হয়। ফলে ভক্তিসঙ্গীতে ওর

যে পরম বিকাশ হতে পারত হয় নি, এ দুঃখ রাখবার আমার জায়গা নেই। কাজী যদি ভক্তিসঙ্গীতে ওর অসামান্য কবিপ্রতিভা নিয়ে নিজেকে পুরোপুরি নিবেদন করতে পারত তো বাংলা কীর্তনাঙ্ক গানও ওর অবদানে সমৃদ্ধতর হ'তই হ'ত। একথা বলছি এইজন্যে যে, গানের রাজ্যে ও ছিল স্বভাব-তুরঙ্গমী—একবার যদি রাশ ছেড়ে ঘোড়া ছোটাতে পারত তবে ওর বাহন হয়ত শেষে পক্ষিরাজের রূপ নিত। তবে এ আমার কল্পনা মাত্র, তাই জোর করে কিছু বলতে পারি না—শুধু এইটুকু ছাড়া যে ভক্তিসঙ্গীতেও ওর প্রতিভা আমাদের ভরসা দিয়েছিল যার নাম "প্রমিস" কিন্তু অকালে ওর কলকণ্ঠ নীরব হওয়ার ফলে ওর সে-সূচনা পরম পরিণতির মোহানায় পৌঁছতে পারে নি।

ওর গীতি-প্রতিভার নানা প্রমিসই পেতাম দিনের পর দিন। কিন্তু সেসব কথা ফলিয়ে লেখার অবসর কোথায়? তাই শুধু শেষে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-পত্রপ্রবন্ধের সমাপ্তি টানব।

একদা আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে ওকে বন্দী করে ওর হাতে কলম দিয়ে বলি: "কাজী ভাই, শরৎসংবর্ধনা আসন্ন, তোমাকে কতবার বলেছি লিখতে একটি গান—"

"সময় পাই নি দিলীপদা—"

"কিন্তু আজ তো পেয়েছ? লেখো" বলে ওকে এক ঘরে পুরে তালাচাবি দিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলাম। ও আধঘণ্টার মধ্যেই লিখে দিলে একটি গান যা আমি শরৎচন্দ্রের সামনে গেয়েছিলাম। গানটির প্রথম চরণ ছিল (এটিও গজল):

"কোন্ শরতে পূর্ণিমা চাঁদ আসিলে এ-ধরাতল?"

এই সুরে সুর মিলিয়ে গাই ওর গুণগান গজল ঢঙেই:

জ্বালতে তারার নীলদেয়ালি এসেছিলে ধরাতল।
তোমার উদার আলোর ঝোরায় করতে কালোর মন উছল।
বরণ ক'রে প্রেমে সবায় ঝরিয়ে গান অঝোরে,
সেধেছিলে প্রতিপদেই আলোকলোকের সুরকমল।
গতির ডাকে দিতে সাড়া ভয় বাসে ঘুমবিলাসী,
করলে তো তাই প্রাণতমসা তোমার গানে সমুজ্জ্বল।

—দিলীপকুমার রায়

নজরুল-সংবিৎ

যে-নজরুল একদিন গল্পে গানে রঙ্গরসে সর্বদা আমাদের মাতিয়ে রাখতো, সে-নজরুল আজ আর নেই। জীবন্ত দেহটি আছে শুধু, সে প্রাণচঞ্চল আনন্দময় মানুষটি আজ আর নেই। আমাদের এ দুর্ভাগ্য অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাকে দেখতে মন চায় কিন্তু দেখলে মন দুঃখে ভারি হয়ে উঠে। বন্ধুজনের এ এক সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা। তার কাছে গেলে কখনো কখনো আশা জাগে—হয়তো নজরুল একদিন ভালো হয়ে উঠবে। হয়তো আবার সে তার সঙ্গীতে, কবিতায় বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলবে। আবার, কখনো কখনো ফিরতে হয় সম্পূর্ণ হতাশা নিয়েই। এই আশা ও হতাশা মনের মধ্যে পোষণ ক'রে আজ প্রায় আটাশ বছর ধরে নজরুলকে দেখে আসছি। হতাশার কথা শুনিয়ে লাভ নেই—আশার কথাই দুটো বলি।

সেটা বোধ হয় ১৯৪৪ সাল। বছর দুই পূর্বে নজরুল উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়েছে। নানাজনেব কাছে নানা কথা শুনি: কেউ বলে, নজরুলের ব্যাধি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে; কেউ বলে, লোক চেনবার শক্তিও লোপ পেয়েছে। একদিন গেলাম তার কম্বুলেটে.তার বাড়িতে। তার শাশুড়ী গিরিবালা দেবী বললেন—"অবস্থা ভাল নয় বাবা। যাও, দেখো গে, ঐ ঘরে আছে।"

ঘরে ঢুকে দেখি—মেঝেয় একখানি মাদুর পাতা, আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নজরুল সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তি। পরনের কাপড়খানার দুটি প্রান্ত দু' হাতে ধ'রে একবার ডাইনে আর একবার বাঁদিকে দোলাচ্ছে। আমি যেন তাকে দেখতেই পাইনি, এই ভাব দেখিয়ে মাদুরের উপর ব'সে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাপড় প'ড়ে এসে মাদুরের উপর ব'সে পড়লো। দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছি। বলা বাহুল্য, তার দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। আমি যেভাবে তার সঙ্গে কথা কইতাম, ঠিক সেইভাবেই বললাম—"কেমন আছ?"

কোনো উত্তর নেই। উত্তর দেবার ক্ষমতাও নেই বোধ হয়। শুনেছিলাম জিভের স্থানবিশেষ নাকি অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু দৃষ্টির পরিবর্তন হ'লো। এ দৃষ্টি অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি নয়,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমি আগের মতো স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম—"আজকাল কিছু লিখছো না?"

কোনো উত্তর নেই। কিন্তু মনে হ'লো উত্তর হয়তো মনের মধ্যে জেগেছে কিন্তু প্রকাশের শক্তি নেই।

এবার আমার মনে প্রশ্ন জাগলো—দেখে আমাকে চিনতে পেরেছে কি না। পকেটে একখানি ডায়েরি ছিল। ডায়েরিখানা বের ক'রে ভিতরের একটি পাতা খুলে তার সামনে এগিয়ে দিলাম। আর আমার কলমটিও দিলাম তার হাতে। বললাম,—"আমার নামটি লেখ তো?"

নির্ভুল বানানে স্পষ্ট লিখলে—নলিনীকান্ত সরকার। তারপর বললাম একটা কবিতা লিখতে। ডায়েরিখানা ও কলমটি নিয়ে সে জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইলো। আমি বললাম—"তোমাব 'বিদ্রোহী' কবিতার তু'চারটি লাইন লেখ না।"

তবু নিষ্ক্রিয়।

তখন আমি 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম তিনটি লাইন ব'লে গেলাম। তিনটি লাইনই সে লিখলো, কেবল তৃতীয় লাইনের শেষের কয়েকটি শব্দের অক্ষরগুলো বাঁকাচোরা হয়ে গেল। কিন্তু যেভাবে বইয়ে ছাপা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবে লাইন তিনটি পর পর সাজিয়ে লিখলো।"

সেদিন কিন্তু মনে হয়নি নজরুল সংবিৎহারা।

এর পর আরও কয়েকবার গেছি। থাকি দাক্ষিণাত্যে, কলকাতা গেলে নজরুলকে দেখতে যাই।

নজরুল যখন মানিকতলায় সেই সময় কয়েকবার তাকে দেখতে গিয়ে প্রায় প্রতিবারেই ফিরেছি তুঃখ ও হতাশা নিয়ে। পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্তা স্ত্রী শয্যায় শুয়ে, আর ঘরের একটি কোণে নজরুল স্তূপীকৃত সাময়িক পত্র নিয়ে একের পর এক একটি পাতা ওলটাচ্ছে। কাছে গিয়ে বসেছি, তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। কিন্তু সে তার কাগজের পাতা ওলটানো নিয়েই ব্যস্ত। ঘরে যে একজন বন্ধু

এসে ঢুকেছে এবং তার কাছেই বসে আছে, সে-দিকে তার কোনোরূপ দৃক্‌পাত নেই। এই অবস্থা দেখেই ফিরে আসতে হয়েছে প্রতিবার। কেবল একটিবার ঐ মানিকতলার রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে ক্ষণেকের জন্যে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলাম। সেদিন তার ঘরে ঢুকতেই, দৃষ্টিবিনিময় হওয়া মাত্র, কী সুন্দর হাসি ফুটলো তার মুখে—যেন হাসি দিয়ে আমাকে স্বাগত জানালে। নজরুলের শয্যাগতা স্ত্রী চমকে উঠে বললেন—"আপনাকে তো চিনতে পেরেছে!"

কিন্তু সে হাসি ঐ একটি মুহূর্তের। তারপর তার চোখে বা মুখে ভাবের কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম না। কাছেই ব'সে রইলাম ঘণ্টাখানেক। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তবু সেদিন একটুখানি ক্ষীণ আশা নিয়েই ফিরেছিলাম—এখনো সে সংবিৎহীন নয়।

তিন-চার বছর পূর্বে একদিন বিকেলে নজরুলকে দেখতে গেলাম তার ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে। একটি ঘরে তক্তাপোশের উপর গিয়ে বসলাম। তক্তাপোশের একধারে একটি হারমোনিয়ম। নজরুলের অপেক্ষায় ব'সে রইলাম। অল্পক্ষণ পরে শ্রীমান্ সব্যসাচী নজরুলকে নিয়ে এসে আমার পাশে বসিয়ে দিলে। কোনো আপত্তি করলে না নজরুল। ঘরের মধ্যে সমবেত কয়েকজন নজরুল-ভক্তের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদের দু'জনের ফটো তুলে নিলেন। বেশ স্থির দৃষ্টিতে ক্যামেরার দিকে চেয়ে বসেছিল সে। ফটো তোলা পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের কয়েকজন ছাত্রী এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। ঘরের মেঝের উপরে তাঁরা বসে পড়লেন। ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে। হঠাৎ নজরুল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে হারমোনিয়মটির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রে অর্ধস্ফুট স্বরে আমাকে বললো—"গাও, গাও"।

এর আগে যতবারই গেছি, নজরুলের মুখে কোনোদিন কোনো কথা শুনিনি।

নজরুলেরই লেখা তিন-চারটি গান গাইলাম। ভাবলেশহীন মুখে

আনন্দের আভাস জেগে উঠলো। সব্যসাচী বললে—"আপনাকে চিনতে পেরেছেন।"

জানি না চিনতে পেরেছিল কি না, কিন্তু সেদিন সম্ভাবনীয় আশার আনন্দ নিয়েই ফিরেছিলাম।

তারপরে গেলাম গত নভেম্বর (১৯৬৯) মাসে। সঙ্গে তিনজন বন্ধু। সব্যসাচীকে আগেই খবর দেওয়া ছিল। গিয়ে দেখি ফরাসপাতা তক্তাপোশের উপর নজরুল ব'সে। তার সম্মুখেই একখানি চেয়ার পাতা। অল্প দূরে আরো কয়েকখানি চেয়ার ছিল, সেখানে আমার বন্ধুরা বসলেন। আমি বসলাম তক্তাপোশের উপর নজরুলের পাশ ঘেঁষে। ব'সে তার পিঠের উপর একটি হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেমন আছ ভাই?"

ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে। দৃষ্টি একেবারে অর্থহীন নয়। সব্যসাচী অদূরে দাঁড়িয়ে, বন্ধুরা চেয়ারে ব'সে আছেন। কথা বলছি তাঁদের সঙ্গে। নজরুল ঘাড় ফিরিয়ে শুনছে সে-সব কথা। আমি তার দিকে চোখ ফেরাতেই সে সামনের চেয়ারখানির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে ইঙ্গিত করলে সেখানে বসবার জন্যে।

এবারেও ফিরলাম আশার আলোক নিয়ে। মনে হ'লো নজরুল লুপ্তসংবিৎ নয়, হয়তো সুপ্ত হয়ে আছে নজরুলের সংবিৎ,—মাঝে মাঝে জাগে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ভগবানের কাছে নজরুল-সংবিতের পূর্ণজাগরণ প্রার্থনা করি। আমাদের আগেকার নজরুল প্রদীপ্ত প্রতিভা নিয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক।

—**নলিনীকান্ত সরকার**

অনিঃশেষ নজরুল

সাহিত্যে নজরুলের আসবার অনেক আগেই বাংলা দেশে বিপ্লববাদী আন্দোলন। সিপাহী বিদ্রোহকে সাধারণ ভাবে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সেদিন সমর্থন করতে পারেননি বটে, কিন্তু সেই আগুনের রঙ ভারতবর্ষের চোখ থেকে কখনো মুছে যায়নি। পাঞ্জাবের বুকে

জ্বালা ছিলই, মহারাষ্ট্রও ধকধক করে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। আমেরিকার গদর পার্টি বহুকাল পর্যন্ত সেই ধারাকে রক্ষা করে এসেছে।

নজরুল যখন বাংলা দেশে সৈনিক কবিরূপে আবির্ভূত, তখন দেশবন্ধুর নেতৃত্বের কাল। গান্ধীজীর প্রভাব বাঙালীর মনে তখনো সীমাবদ্ধ। স্বরাজ্যদল নিয়ে দেশবন্ধু কাউন্সিলে ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির চক্রান্ত ভাঙবার জন্যে উদ্যত সংগ্রামী—তাতে কংগ্রেস কিম্বা মহাত্মাজীর সহযোগিতা নেই। দেশবন্ধুকে ঘিরে বাংলা দেশে তারুণ্যের উতরোল জোয়ার। অন্যদিকে মানিকতলা বোমার মামলার ইতিহাস থামেনি—অরবিন্দ সরে গেছেন, কিন্তু আছে 'যুগান্তর' দল, গড়ে উঠেছে 'অনুশীলন'। বিপ্লববাদী কর্মধারাকে দেশবন্ধু মানতে পারেননি, কিন্তু গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে দ্বিধা করেননি তিনি। জাতীয় আন্দোলনের ধারায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা একটা বড়ো বাধা হয়ে রয়েছে—হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের সাহায্যে দেশবন্ধু তার সমাধানের চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে রুশিয়ায় ঘটে গেছে অক্টোবর বিপ্লব—সাম্যবাদী চিন্তাধারা ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

নজরুলের বিকাশ এই পরিবেশের ভেতরে।

এসেছিলেন একেবারে দুরন্ত প্রাণোচ্ছ্বাস নিয়ে। 'আমি মানি নাকো কোনো আইন।' না ভাষায়, না ছন্দে, না মূল্যবোধে। নিজের মধ্যে সেই শক্তির প্রচণ্ড অনুভব—যা বাসুকী নাগের ফণা সাপটে ধরতে পারে—যা স্রষ্টার বুকে ভৃগুর মতো পদচিহ্ন আঁকার দুঃসাহস রাখে, যা বিষ্ণুর বক্ষ থেকে 'যুগল কন্যা' ছিনিয়ে আনবার স্পর্ধা। আবার 'তন্বী নয়নের বহ্নি' হতেও আপত্তি নেই সেই সঙ্গে।

অ্যানার্কির মতো মনে হয় প্রথমে। 'প্রবাসী' পত্রিকার সমালোচক যখন এই কবিতা সম্পর্কে বিরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তিনিও এই রকম ভেবেছিলেন। কিন্তু এই কবিতায় কেবল নৈরাজ্যের উত্তেজনাই ছিল না। 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' কবে শান্ত হবেন, সে প্রশ্নের উত্তরও কবিতার শেষের দিকেই ছিল।

দেশে রাজনীতির ঝড় বয়ে যাবে অথচ নজরুল থাকবেন

তার নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র, এমন অঘটন ঘটতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথকে গুরু-বরণ করেছিলেন তিনি। বিশ্বমৈত্রী, অধ্যাত্ম-ভাবনা, দেহাতীত প্রেমের আরাধনা, প্রকৃতি-জিজ্ঞাসা—রবীন্দ্রমানস দিকে দিকে প্রসারিত হলেও দেশের কোনো সমস্যা, কোনো সংকট, কোনো আন্দোলন, জাতীয় সংগ্রামের কোনো উত্তুঙ্গ অধ্যায়—'হিন্দুমেলা'য় প্রথম উন্মেষপর্ব থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এদের প্রতিটিতে স্বাক্ষর রেখেছিলেন। রবীন্দ্রশিষ্য নজরুল এই ঝড়ের মধ্যে ডানা মেলবেন—এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক!

আর বাঙালী কবিরা তো রঙ্গলাল থেকেই জাগ্রত। 'আনন্দমঠ', বঙ্গভঙ্গ তার চোখের ঘুম কেড়েছে চিরকালের মতো। হেম-নবীন পিছিয়ে ছিলেন না। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' সোজা সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছে—রক্তকে দোলা দিয়েছেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ইতিহাস চলছিলই। নজরুল মাঝখানে এসে জায়গাটি খুঁজে নিলেন।

সেদিনের যৌবন চাইছিল, আসুক তার এক দুরন্ত বাণীমূর্তি। "মাগো, যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে, তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ বলে"—এ গান ছিল। ছিল রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক এবং উপচিত স্বাদেশিকতা। আরো অনেকে ছিলেন। কিন্তু এমন কবিকে চাই—যিনি এই মুহূর্তের, আজকের সংগ্রামের—কালের প্রতিটি স্পন্দনের প্রবক্তা। দুঃসাহসী, দুরন্ত। নজরুলের মধ্যে যৌবনদীপ্ত বাঙালীর সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হল।

নজরুলের অনন্য জনপ্রিয়তার মূল এইখানে। রাজনীতিতে তিনি দেশবন্ধুর শিষ্য। সাম্প্রদায়িকতার তুচ্ছতা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত বিশাল-হৃদয় এই মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন দেশবন্ধুর সেই ব্যক্তিত্বে—সংকল্পে যা অকুতোভয়, মমতায় যা উদ্বেলিত। ফলে বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের সাধনার সঙ্গে নজরুলের মধ্যে ধরা দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ:

"গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ, অজাযুদ্ধের মেলা।
এদেরি রুধিরে নিয়ত রাঙিছে ভারত সাগর বেলা।"

বিপ্লববাদী কর্মধারাকে সমর্থন করা দেশবন্ধুর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু সেই আত্মদান—সেই মৃত্যু-বরণের কঠোর তপস্যা—যৌবনমূর্তি নজরুল তার ডাক কেমন করে উপেক্ষা করবেন ? "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান"—তারা সামনে এসে দাঁড়ালে কোন্ বলিদান অদেয় আছে তাদের ? অতএব 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত। নজরুলের কাব্য তাই তরুণ বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়েছিল।

তখনকার বাঙালী তরুণদের মতো গান্ধীজী সম্পর্কে নজরুলের চিন্তাও মিশ্রিত। মহাত্মার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার প্রকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেকালের বাংলা দেশের রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা গান্ধীজীর নয়—তাঁর অহিংসা-তন্ত্র রুদ্রপন্থী যুবসমাজের মনে দানা বাঁধেনি। সুতরাং "সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই—" এ চিন্তা নজরুলের অসহ্য। তার চাইতে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দীপ্ত ভাবনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে বেশি।

আর সাম্যবাদ। "গাহি সাম্যের গান। যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।" অতএব 'কৃষকের গান', 'শ্রমিকের গান'। ইণ্টারন্যাশনাল গানের অনুবাদ। 'লাঙল' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

বাংলা দেশে সর্বাধিক সঙ্গীতের রচয়িতা (স্বদেশী গানগুলো বাদ দিয়ে) গীতিকার নজরুল ইসলামের আর একটা সুমহান পরিচয় আছে। কিন্তু যে 'বিদ্রোহী কবি' যুবক-বাঙালীর হৃদয়ে দীপ্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—যুগ-চিন্তার এই চতুর্ধারাকেই নিজের মধ্যে সমন্বিত করেছিলেন তিনি। এর ফলে তিনি কেবল স্বয়ম্প্রভ নন—একক নন—তাঁর একটি উত্তরাধিকারের ধারাও রচনা করে গেছেন।

সেই ধারায় বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—বেন্‌জির আহ্‌মেদ ('বন্দীর বাঁশি') থেকে আরম্ভ করে দিনেশ দাস—সুভাষ মুখোপাধ্যায়—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

নজরুল নিঃশেষিত ?

কে বলে ? তিনি প্রাণের স্রোতে নিয়ত বহমান॥

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার কৈশোর-স্মৃতিতে নজরুল

সাল-তারিখ কিছুই সঠিকভাবে মনে নেই। আমি শান্তিনিকেতনের বালক-ছাত্র। পুজোর ছুটি শেষ হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সবাই এসে পড়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বাইরে ঘুরে ফিরে এসেছেন। আশ্রম বেশ জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে পাঠভবন, কলাভবন ও বিদ্যাভবনের শিক্ষা। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু তখনও আসেন নি। শ্রীঅসিতকুমার হালদার তখন কলাভবনের হাল ধ'রে রয়েছেন। শিক্ষাভবন তখনও শুরু হয় নি। পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাহেবদের দোতলা বাড়ির ওপরতলায় কলা-ভবনের শিক্ষাচর্চা চ'লত। এই দোতলায় মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ তখন কবিতা পাঠ ক'রে শোনাতেন। বড়রা সকলেই শুনতে আসতেন এবং কবিতা-পাঠের পরে কোনো কোনো সময় দু একজন দু-একটা প্রশ্ন করতেন। এই বড়দের দলে ছোট বয়সের আমিও দাদা সুধাকান্তর সঙ্গে কবিগুরুর পাঠ শুনতে যেতাম। বুঝতাম না কিছুই, কিন্তু শুনতে ভারি ভাল লাগত। আমার বয়েস তখন বারো-তেরো হবে বোধ হয়।

সবে শিশুবিভাগ থেকে নতুন গুরুপল্লীতে দাদা সুধাকান্তর বাড়িতে এসেছি। বৌদি তাঁর শিশুপুত্র সৌম্যকান্তকে নিয়ে পিত্রালয় শিবহাটি গ্রাম থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। এই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে দাদা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বলছেন শুনলাম— হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুধাকান্তর ওপরই ভার পড়ল তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার, অতিথি-ভবনে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার ও কবিগুরুর সঙ্গে তাঁকে দেখা করিয়ে দেবার। আদি গুরুপল্লী ভুবনডাঙার বাঁধের কাছে নতুন গুরুপল্লীতে আসার পর এই বাড়িটিতেই সুধাকান্তর বন্ধুরা আসতেন এবং তাঁদের

আড্ডাটি বেশ জমে উঠত। সুধাকান্ত ছিলেন মজলিসী মানুষ। নানা কথাবার্তার মধ্যে নজরুলের কবিতা নিয়ে আলোচনা হ'ত। নজরুলের নামটি আমি এই সময়েই প্রথম শুনি এবং ক্রমে তা আমার অত্যন্ত পরিচিত হয়ে ওঠে। সেই নজরুল এখানে এসে উপস্থিত হবেন—এ খবরটি আমাকে বেশ উদ্দীপিত ক'রে তুলল। দাদার সঙ্গে নজরুলের সবিশেষ পরিচয় আছে—এ খবরটিও আমার কাছে বিশেষ আনন্দের হয়ে উঠল।

তখন আমাদের বাড়িতে 'প্রবাসী', 'মানসী ও মর্মবাণী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আসত, তাও মনে পড়ে। তখন থেকেই আমার কবিতা-পাঠের একটা ঝোঁক এসেছিল। সব যে বুঝতাম তা নয়, তবু ঐ পত্রিকাগুলি পেলেই তার মধ্যে কবিতাগুলি পড়ে নেওয়া আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নজরুলের নাম শোনবার পর তাঁর কবিতা দেখবার আশা নিয়ে আমি এই পত্রিকাগুলির পাতা উল্টে নিরাশ হ'তাম, তাঁর কবিতা দেখতে পেতাম না। পরে যখন 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা দাদার কাছে আসতে লাগল, তখন নজরুলের কবিতা নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকার প্রথম দিকেই দেখতে পেতাম ও সাগ্রহে পাঠ করতাম। কবিতার রসবোধ তখন যতই কাঁচা হোক, নজরুলের এই কবিতাগুলি আমার কৈশোরের স্মৃতিতে আজও প্রোজ্জ্বল, আমার মনকে রীতিমত আকর্ষণ করত এবং পড়তে একটা ভাল-লাগা শুধু নয়, একটা সতেজ আনন্দ অনুভব ক'রতাম। সব কবিতা তলিয়ে না বুঝলেও, নজরুলের কবিতার একটা নতুনত্ব আমার মনে রেখাপাত ক'রত, মনে হ'ত যেন কবিতাগুলির স্বকীয়ত্ব ও প্রকাশভঙ্গি আমার পূর্ব-পরিচয়ের স্বাদ থেকে ভিন্ন জাতের। অতি শৈশব থেকে শান্তিনিকেতনে জীবন কাটছে, কবিগুরুর কবিতা ও গানে কান ও মন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবু নজরুলের এই কবিতার একটা নতুন রকম জোরালো ধরন ও ভাববিভোর মিষ্টতা আমার কৈশোরকালের দৃষ্টিও এড়িয়ে যায় নি। অবশ্য এর মূলে ছিলেন দাদা সুধাকান্ত। তিনি আরও অন্যান্য কবিদের কবিতা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতেন—

তাঁদের নামও তখনই জেনে ফেলেছিলাম—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—এই তিনজনের নামই বেশি ক'রে কাজী নজরুল ইসলামের নামের সঙ্গে প্রায়ই শুনতাম। আর, সুধাকান্তর কাছে শুনতাম স্বনামধন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাহিত্য-কীর্তির কথা—তাঁর দু-একটি বইও ইতিমধ্যে পড়েছিলাম—'বঙ্গ আমার, জননী আমার' যখন সুরে শুনতাম, তখন আমার দেহে-মনে রোমাঞ্চ হ'ত, আজও তা হয়। এই সব কবি-সাহিত্যিকদের আমি শান্তিনিকেতনে আমার শৈশব ও কৈশোরে কোনোদিন দেখি নি। তাই, আমার না-দেখা কবিদের একজন অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম আসবেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্যে একটা প্রবল ঔৎসুক্য ও উৎসাহ বোধ ক'রলাম। শুনলাম, পূর্বোল্লিখিত কলাভবনের দোতলায় সান্ধ্য-আসর বসবে, সচকিত মন নিয়ে দাদার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম, কবিগুরু বসে আছেন মাঝখানে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ সকলেই সমবেত হয়েছেন। কবিগুরুর পাশে দুজন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন, তাঁদের একজনকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে ব'ললেন—ঐ দেখ্ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা গিয়ে নজরুলের সান্নিধ্যে ব'সলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ্-পরা, কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন, কবিগুরুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে আলাপ ক'রছেন, নজরুলও সেই আলাপে যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর নামটি আজ আর সঠিক মনে করতে পারছি না, তখন নজরুলই আমার সমস্ত আকর্ষণের উপলক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তবু যতদূর মনে হয়, তিনি হয়তো ডাঃ শহিদুল্লা সাহেব হবেন। তিনি কবিগুরুকে ব'লছিলেন—ট্রেনে আসতে আসতে কাজীসাহের আপনার গীতাঞ্জলির সব কটা গান আমাকে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিগুরু ব'ললেন,—তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলির গান সব তো আমারই মনে থাকে না। কাজীসাহেব ব'ললেন—গুরুদেব, আমি আপনার কণ্ঠে আপনার একটি গান ও একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই। শুনে কবিগুরু বললেন,—সে কি? আমি যে তোমার

গান ও আবৃত্তি শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে আছি, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও, আমাকে আবার রাত্রিবেলায় লেখায় ব্যাপৃত হ'তে হবে। নজরুল দ্বিরুক্তি না ক'রে আবৃত্তি শুরু ক'রলেন। পুজোর ছুটির পরের ঘটনা, সেজন্যে মনে পড়ে, একটি পুজোর কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। পরে জেনেছিলাম—সেটি 'অগ্নি-বীণা'-র 'আগমনী' কবিতাটি। তার থেকে বিশেষত্বমণ্ডিত কয়েকটি লাইন উদ্ধার ক'রে দেখছি—তা যেন আজও কানে শুনছি ঃ

একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রণরণ রণ ঝনঝন !
সে কি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি'
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি'
ওঠে চোটে চোটে,
ছোটে লোটে ফোটে !
বহ্নি-ফিনিক চমকি' চমকি'
ঢাল-তলোয়ারে খনখন
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
রণ ঝনঝন ঝন রণরণ !

* * *

পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে মিশে যায় শির পশুর !

* * *

ঐ ঐ ঐ বিশ্বকণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্" !!

কিছুক্ষণ পরেই আবৃত্তির মোড় ঘুরে গেল। শুনতে পেলাম ঃ

আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া
ঐ শেফালিকা তলে কে বালিকা চলে ?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া !

এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ঐ,
সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা
এলো বীণা-পাণি অমলা ঐ !
এসেছে গণেশ,
এসেছে মহেশ,........

এইভাবে একটা অন্তর-স্পর্শী ভাব-ব্যঞ্জনা নিয়ে কবিতাটির আবৃত্তি শেষ হ'ল। নজরুলের একটি সপ্রতিভ ভাব আমার কিশোর-মনকে গভীরভাবে মুগ্ধ ক'রেছিল। তাঁর চোখ-মুখের দীপ্তি ও অনায়াস-আয়ত্ত ভাবোচ্ছ্বাস একটা প্রাণোচ্ছলতার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিল। গান বা আবৃত্তির অনুরোধ এলে একটা সঙ্কোচ প্রকাশের রীতিই সচরাচর চোখে প'ড়ত, কিন্তু নজরুলের এই বিনা দ্বিধায় বা দ্বিরুক্তিতে আত্মপ্রকাশের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা আমার সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে যেন ছবি হয়ে উঠল। আজও বলতে পারি—সে-আবৃত্তি পৌরুষ-ব্যঞ্জক, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তা স্মরণ করতে গিয়ে আজও আমার অন্তঃশ্রুতিতে নজরুলের সেই ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনি তুলছে। বলাই বাহুল্য, কবিগুরুর আবৃত্তির যে স্বাদটির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম, এর স্বাদ তা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন—এই অভিনবত্বের আস্বাদটিই তখন আমাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত ক'রেছিল।

আবৃত্তির পরে কবিগুরু তাঁকে গান গাইবার আহ্বান জানালেন। এবার তাঁর কণ্ঠে একটি বিষাদঘন করুণ সুর বেজে উঠল। গানটি পুত্র বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর। তারও খানিক অংশ উদ্ধৃত করি :

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা,
ওরে আমার পলাতকা !
ও তোর প'ড়ল মনে কোন্ হারা-ঘর রে,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা !

* * *

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে,
যাদুমণি, বল সে কিসে রে,

শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন,
চোখভরা তোর উছলে কাঁদন রে,
কে পিয়ালো সবুজ স্নেহের কাঁচা বিষে রে !

....

এই গানের সুরেও একটি নতুনত্ব সুস্পষ্ট দেখলাম—তাই খুবই ভাল লেগেছিল এবং আবেশে আপ্লুত হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর হয়তো খুবই মধুর ছিল না, কিন্তু তা এমনই ভাবব্যঞ্জক যে আমার মত অবোধ কিশোর-শ্রোতার অন্তরকেও বিপুল আনন্দ-স্পর্শ দান ক'রেছিল। গানটি শুনে কবিগুরু বলে উঠলেন—বাঃ, বেশ! এটি কবে লিখলে? ফেজ্-পরা ভদ্রলোকটি বললেন,—সম্প্রতি কাজীসাহেব তাঁর একটি শিশুপুত্রকে হারিয়ে এই শোক-গাথাটি রচনা ক'রে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছেন। কবিগুরু কিছুক্ষণ নীরব থেকে যেন সমবেদনা প্রকাশ করলেন।

কিছু পরে কবিগুরু ব'ললেন,—তোমরা কি কালই সকালে চ'লে যাবে? দু-একদিন থাকতে পার না? শুনে ভদ্রলোকটি বললেন,—থাকতে পারলে খুবই ভাল হ'ত, কিন্তু কাজী সাহেবের যে নানা কাজের পূর্ব-ব্যবস্থা স্থির আছে। কাজী সাহেব বলে উঠলেন,—গুরুদেব, এবার আপনার একটি আবৃত্তি ও একটি গান আমরা শোনার জন্যে একান্ত উৎসুক। কবিগুরু জানালেন,—গান এখন আর গাইতে পারি না, সুর ভুলে যাই। আমার একটি সম্প্রতি-লেখা গান, কবিতায় আবৃত্তি করি। তোমরা যেমন হঠাৎ এসেই চ'লে যেতে চাচ্ছ, আমার গানের মাধবীও তেমনি হঠাৎ এসেই চলে যেতে চায়। কবিগুরুর সুললিত ও রমণীয় কণ্ঠে বেজে উঠল :

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে, 'যাই যাই যাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই॥

ইত্যাদি

কবিগুরু যতক্ষণ আবৃত্তি করছিলেন, ততক্ষণ কবি নজরুলের কালো বাবরি চুলের মাথাটি আবৃত্তির তালে তালে দুলছিল এবং তাঁর মুখ-চোখ একটা আবেশমুগ্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিল। আবৃত্তি শেষ ক'রে কবিগুরু দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং সমবেত সকলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। বিদায়ের একটি অনুচ্চারিত বেদনার সুর বেজে উঠল। এরই ফাঁকে কাজী সাহেব আমাকে দেখিয়ে দাদা সুধাকান্তর কানে কানে নিম্নস্বরে বললেন,—এই বয়স্কদের আসরে এই বাচ্চা ছেলেটি কে? সুধাকান্ত বললেন,—ওটি আমার ভায়া, কবিতার ভক্ত, এই বয়েসেই কবিতা লেখার ঝোঁকে খাতা ভরাচ্ছে। নজরুল আমার দিকে স্মিতহাস্যে তাকালেন, আমিও সলজ্জভাবে তাঁকে দেখলাম।

নজরুলের সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার। পরবর্তী কালে এই ভাগ্যাহত কবির কাব্য-জিজ্ঞাসার ও জীবন-যন্ত্রণার পরিচয় আমাকে আনন্দ-বেদনার দ্বৈত আন্দোলনে আলোড়িত করেছে এবং বার বার তাঁর সূত্রে আমার এই কৈশোর-স্মৃতি মথিত হয়ে উঠেছে।

সুধাকান্ত আজ আর নেই। তিনি থাকলে নজরুল-সান্নিধ্যের অনেক চিত্রই হয়তো আজ উদ্ঘাটন করতে পারতেন।

—নিশিকান্ত

দেশাত্মবোধ ও কবি নজরুল

কবি নজরুলের দেশাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য তাঁর আন্তরিকতা এবং তাঁর মধ্যে অনুকল্প অন্য কিছুর সঙ্গে রফা করার প্রশ্ন নেই।

কিন্তু দেশাত্মবোধ বলতে কি বোঝায় তার মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার।

আমাদের দেশ বহুকাল পরাধীন ছিল। এই পরাধীনতার বিরুদ্ধে এবং বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছেন, তাঁরা এবং সম্ভবত একমাত্র তাঁরাই দেশপ্রেমিক বলে বেশি খ্যাত হয়েছেন। এবং যাঁরা পরাধীনতা বা বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহিত্য

রচনা করেছেন তাঁরাও দেশপ্রেমিক আখ্যা পেয়েছেন। অতএব এ থেকে সাধারণভাবে আমাদের এমন ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াইটাই হচ্ছে দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেম। আর ঠিক এই কারণেই এমন সিদ্ধান্ত হতে পারে যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এদেশে আর কেউ দেশপ্রেমিক নেই। এবং দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন বলে খ্যাতিলাভ করার সম্ভাবনাও এখন কারো আর নেই।

দেশাত্মবোধকে এই অর্থে গ্রহণ করলে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, এ কথা সত্য হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্যই দেশাত্মবোধের একটি বড় পরিচয়, কিন্তু সেটাই সব পরিচয় নয়। কারণ পরাধীনতা তো শুধু একটি বিষয়েই নয়। মানুষ তার অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে চলতে চায়, কিন্তু পথে কত বাধা। অনেক বাধা তার নিজেরই সৃষ্টি। অনেক শিকল সে অজ্ঞানতাবশত বা অভ্যাসবশত নিজেই নিজের পায়ে পরিয়েছে। ভীরুতার শিকল, অর্থহীন আচারের শিকল, হীনতাভাবের শিকল। এ সবই মানুষকে পরাধীন করে রাখে। একটি দেশের বা একটি জাতির পরাধীনতার এই সামগ্রিক রূপ যাঁর চোখে ধরা পড়ে, এবং যিনি জাতিকে সকল পরাধীনতার শিকল ভেঙে ফেলতে সাহায্য করেন, তিনি বড় দেশপ্রেমিক। তার অর্থ: দেশপ্রেমিক হতে হলে তাঁকে মানবপ্রেমিক হতে হবে আগে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেবার পূর্বধাপ হচ্ছে মানুষের মনকে বহু জাতীয় পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া। অথবা ও দুটি কাজ একই সঙ্গে চলতে পারে। দেশপ্রেম মানবপ্রেমের পরিপূরক, দুইয়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই।

কবি নজরুল যে সব দেশাত্মবোধক কবিতা বা গান রচনা করেছেন তাতে মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম দুই-ই পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে। এইখানে নজরুলের কবিমানসের আসল পরিচয়। দেশপ্রেমের নামে উত্তেজনাপূর্ণ গান রচনা করে বিদেশী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সহজে উত্তেজিত করা যায়। মুমূর্ষু লোকও তাতে ক্ষণকালের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেটি হল সম্পূর্ণ

বাইরের জিনিস। সহজ কবিত্বশক্তি থাকলে যে-কোনো ব্যক্তি হিংসা-মূলক গান বাঁধতে পারে, তার মধ্যে গভীরতার পরিচয় না থাকলেও চলে, হৃদয়ের পরিচয় না থাকলেও চলে।

কবি নজরুল সে পথের পথিক নন। তাঁর দেশাত্মবোধে বড় কবির কাছ থেকে অপেক্ষিত পূর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ তিনি যথার্থ কবি, তাঁর মন যথার্থ কবিধর্মী। এবং যথার্থ কবিধর্মী আমি সেই মনকেই বলব যার মধ্যে মানুষের প্রতি প্রেমে কোনো ভেজাল নেই। কবি নজরুল এই হিসেবে যথার্থ কবি। তাঁর কাব্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা, মানুষের আত্মার অসম্মানজনিত তীব্র ক্ষোভ কবির মনের একটি ভঙ্গিমাত্র নয়। মনুষ্যত্বের উন্মেষ না হলে দেশাত্মবোধ অর্থহীন এ কথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। যখন তিনি বলেন—

"বল বীর
চির উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি
নতশির ঐ
শিখর হিমাদ্রির!"

তখন আমরা দেখি কবি দেশের মানুষকে আত্মবিশ্বাসের মহিমায় জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। একটা জাতি যখন বহুদিনের পরাধীনতায় নির্বীর্য হয়ে পড়েছে, নিজের শক্তিতে শ্রদ্ধা নেই, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নামক কোনো বস্তু আছে বলে বিশ্বাস নেই, তখন তার কানেই তো আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র ধ্বনিত করা সবচেয়ে আগে দরকার। এ কাজ করতে গিয়ে কবি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার যে কত বড় পরিচয় দিয়েছেন তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

এ শুধু রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খল ভাঙায় বিদ্রোহ-বাণী নয়। সে প্রশ্নই এখানে ওঠে না। এ একটি ভীরু জাতির শিরায় শিরায় আত্ম-অসম্মানকর কাপুরুষতার বিরুদ্ধে জেগে ওঠবার মন্ত্র সঞ্চারণ।

এই 'বিদ্রোহী' কবিতাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঠকের চেতনাকে বহু পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করাতে করাতে টেনে

নিয়ে যাওয়া। এর সার্থকতাও এইখানে। এর প্রয়োজন ছিল। যে লোকটি বহুদিনের অভ্যাসে নিজেকে অসহায় ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারে না, তাকে সহসা সকল ভীরুতা এবং জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে, তার সমস্ত বাঁধা ধারণাকে ওলট-পালট করে দিয়ে, তার ভীরুতাধর্ম থেকে উদ্ধার করে তাকে আত্মশক্তিবোধের ধর্মে দীক্ষিত করে ছেড়ে দেওয়া—

"আমি সহসা আমারে চিনেছি
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !"

আবও পরিচয়—

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি শান্ত উদার
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব
অবহেলে মহা সৃষ্টির মহানন্দে।

তারপর—

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশ বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !"

সবশেষে আবার আত্মপরিচয়, চিঠির শেষেব পুনশ্চের মতো—

"আমি চিরবিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির-উন্নত শির"

এই একটি মাত্র কবিতার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হলেই বোঝা যাবে কবির দেশাত্মবোধের ভবিষ্যৎ রূপটি কি হবে। এটি

সেই ভবিষ্যতের ভূমিকা মাত্র। এগিয়ে চলতে হলে আগে বিপ্লব ঘটাতে হবে এবং সে বিপ্লব মনের বিপ্লব। এবং বহুদিনের সংস্কার-জর্জর মানুষের মনে ঘটাতে হবে সেই সকল বিধিবিধান ওল্টানো বিপ্লব। মনের দিক দিয়ে এই পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে দেশপ্রেম দাঁড়াবে কোথায়? সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখা সত্যের বাইরেও যে সত্য আছে তা দেখাবার সহজ এবং একমাত্র উপায় এটি। হঠাৎ সব উল্টেপাল্টে দেওয়া। কিন্তু শুধু তাই নয়, এর প্রতি পদে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—

"বল বীর
চির উন্নত মম শির।"

নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছেন কবি তাঁর এই 'বিদ্রোহী' কবিতায়।

এতটা ভূমিকা করলাম শুধু এইটে দেখাতে যে দেশপ্রেমিক কবি নজরুল কখনো তাঁর দেশের মানুষকে শস্তা সেন্টিমেন্টের ক্ষেত্রে ডাকেননি। তাঁর দেশাত্মবোধের প্রথম শর্ত মনুষ্যত্ববোধ। এ কথাটা ভালভাবে মনে রাখতে হবে। অতএব 'বিদ্রোহী' কবিতার পাশে এবারে দেখা যাক—

"সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা?"

এখানেও দেখা যাবে কবির দেশাত্মবোধ ন্যায় ও সত্যের মহত্তর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশী শাসকের কারাগারে বন্দী থাকা হীন অপমান, কিন্তু এ কবিতার সেটাই শেষ কথা নয়। মিথ্যার পায়ে মাথা নত করবে, সত্য কি এতই ভীরু? কবি এই বৃহত্তর প্রশ্নটি তুলে তাঁর দেশাত্মবোধের দিগন্ত বিস্তার করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন—

"ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার"

তখন তিনিও ভীরুকে লজ্জা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, দেশাত্মবোধ থেকেই। সত্য কবি মাত্রেই আপন চেতনার ভিতর দিয়ে সকল পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে সকল বন্ধন ভেঙে বিশ্বপরিক্রমা করে ফেরেন। তাই মনুষ্যত্বের প্রতি অতি মমত্বসম্পন্ন কবি কারাবন্ধনরূপ অপমানে বিচলিত হবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক—

বন্ধন দু রকম। একটি স্বেচ্ছাবন্ধন, যার মূলে প্রেমপ্রীতি আর জীবনের ছন্দ, যাতে শুধু কল্পনার বন্ধন নেই, একমাত্র এই বন্ধন কবির কাম্য। স্বার্থের বন্ধন মানবপ্রেমিকের চোখে, কবির চোখে, অবশ্যই অপমানকর। তাই কবি যেখানে বলেছেন—

"(আজ) ভারত ভাগ্য বিধাতার বুকে
গুরু লাঞ্ছনা পাষাণ ভার
আর্ত নিনাদে হাঁকিছে নকিব
কে করে মুশকিল আসান তার ?
মন্দির আজি বন্দীর ঘানি
নির্জিত ভীত সত্য বন্ধ রুদ্ধ
স্বাধীন আত্মার বাণী
সন্ধি মহলে ফন্দীর ফাঁদ
গভীর আন্ধি অন্ধকার
হাঁকিছে নকীব, হে মহারুদ্র,
চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার।"

সেখানেও আমরা দেখছি চাপানো বন্দিত্বের পাষাণভারের বিরুদ্ধে কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে মহারুদ্রকে আহ্বান জানাচ্ছেন—এই কৃত্রিম কারাবন্ধনকে চূর্ণ করতে।

"মৃত্যু আহত মৃত্যুঞ্জয়
কে শোনাবে তাঁর চেতনমন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয় ?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল
বলদর্পীর অহঙ্কার ?

হাঁকিছে নকীব—সেদিন বিশ্বে
খুলিবে আরেক তোরণ দ্বার।”

এখানেও সমগ্র মানব-আত্মার প্লটেই দেশাত্মবোধকে দেখার প্রয়াস।

উত্তেজক দু-চারটে কথায় একটা জাতিকে সাময়িকভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা যায় অবশ্যই, কিন্তু তাতে প্রবলতর প্রতিপক্ষ ভীত হয় না। তার প্রধান ভয় দুর্বল জাতির আত্মবোধের প্রতিষ্ঠায়। সাময়িক উন্মত্ততা অস্ত্রবলে শান্ত করা যায় কিন্তু আত্মিক শক্তিকে জয় করা কঠিন। কবির যে ‘বিষের বাঁশী’ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাতে জাতির এই আত্মিক জাগরণের সুরটিই প্রধান। কবি কখনো সোজা জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানাচ্ছেন, কখনো ঈশ্বরের উদ্দেশে। যেখানে কবি বজ্রগম্ভীর, কম্বুকণ্ঠ, সেখানে কবি জাতিকে জাগার মন্ত্র দিচ্ছেন। যেখানে কবি আত্মগত, যেখানে তিনি তাঁর ঈশ্বরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সেখানে কণ্ঠে কি কাতর নিবেদন—

“বাজাও, প্রভু বাজাও, ঘন বাজাও,
ভীম বজ্র বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব বাজাও—
অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জাবৃত্তি
বিনাশো জাতির দরুণ এ লাজ,
দাও তেজ দাও মুক্তি-গরব
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও
....
ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন

আনো আঘাত প্রচণ্ড আহব।

দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও।"

কি সুন্দর পোয়েট্রি এই গানটিতে! এ যেন কোনো নির্জন স্থানে বসে প্রার্থনার গান গাওয়া। চোখের জল আছে এর সুরের সঙ্গে মিলিয়ে।

যখন গান্ধীজী বন্দী, যখন দলে দলে সত্যাগ্রহী বন্দী হচ্ছে, তখন কবি আবার জাতির কানে অভয় মন্ত্র দিচ্ছেন—

"বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়!
বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়।
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ পুরুষোত্তম জয়!
তুই নির্ভর কর আপনার পর
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর!
ওরে যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল, আমার হয়নি লয়।
বল্, আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম আমি চির দুর্জয়।
....
ওরে সত্য যে চির-স্বয়ম্ প্রকাশ,
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন? আছে তার আছে ক্ষয়!
....
যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি
তোদের পাত্র দিয়া গেল ভরি
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনি কো তাঁরে
পারেনি করিতে লয়।
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে
সে আজ শান্তিময়।"

এত বড় বলিষ্ঠ বিশ্বাসের ছবি এমন অগ্নিগর্ভ ভাষায় প্রকাশ একমাত্র নজরুলের পক্ষেই সম্ভব। এমন দুর্ধর্ষ আশাবাদীর সুর ছিল কবি নজরুলের কণ্ঠে। শিকলের মধ্যেই মুক্তির ছবি দেখছেন কবি।—

"এই শিকল-পরা ছল মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥"

কি আভিজাত্য! তোমাদের বন্ধনের হীনতার ভিতর দিয়েই আমরা সম্মানের আকাশে মাথা তুলব। "এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা!" চার্চিল যাকে Beginning of the end বলেছিলেন, এও ঠিক তাই। চার্চিলের কথা যেমন হিটলারের বিরুদ্ধে সত্য হয়েছিল, কবি নজরুলের এই শিকলের বাণীও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তেমনি সত্য হয়েছে। মূল্যের দিক থেকে দুটি বাণীই সমান্তরাল। কবিতাটির আরও খানিকটা শোনাই—

"এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করবে রে বিকল।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥
....
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়।
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল ॥"

—পরিমল গোস্বামী

নজরুল কাব্যের মূল্যবিচার

কবিদের খ্যাতির অদৃষ্ট বড় বিচিত্র। একবার কপালে এক রকম ছাপ প'ড়ে গেলে আর মুছতে চায় না। ইংরাজি গীতাঞ্জলির সুবাদে পাশ্চাত্ত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মিস্টিক কবি। গেল সোনার তরী, চিত্রা চৈতালি, ক্ষণিকা, কল্পনা, কর্ণ কুন্তী সংবাদ, নরক বাস। মিস্টিক ছাপ আর ঘুচলো না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছান্দসিক'—যেন ছন্দের কারসাজিতেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। "একটি নূতন তন্ত্র" বঙ্গভারতীর বীণায় পরাবার জন্যে কবি এসেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ এই ভুল ধারণার সমর্থন ও পুষ্টিসাধন ক'রে গিয়েছেন। ফুলের ফসল ও কুহু ও কেকায় এমন অনেকগুলি কবিতা আছে যা বঙ্গ-ভারতীর শিরোভূষণ। কিন্তু হলে কি হয়, তিনি যে 'ছান্দসিক'। এই ভুল ইঙ্গিতের প্রেরণাতেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সঞ্চয়ন গ্রন্থে চার্বিক ও মঞ্জু ভাষা নামে কবিতাটি বাদ পড়েছে। এটি সত্যেন্দ্রনাথের তথ্য। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক বিশিষ্ট বন্ধু।

কাজী নজরুল ইসলামের কপালে ছাপ পড়ে গিয়েছে বিদ্রোহী কবি বলে। প্রেম ও ভক্তির কবিতা ও গানগুলি যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা একরকম চাপা পড়ে গেল। যৌবনের ও রাজনীতির উন্মাদনায় যে-সব কাবতার সৃষ্টি হয়েছিল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েও তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এখন আর সেই ছাপ দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা শুধু নিরর্থক নয়, কবির খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

এমন যে হয়ে থাকে তার কারণ অধিকাংশ মানুষ জহুরি নয়; সোনার মূল্য বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই; সোনার উপরে রাজার মুখের ছাপ দেখতে পেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়। সোনার ক্ষেত্রে যা সত্যোপম কাব্যের ক্ষেত্রে তা সত্য। প্রাকৃত জন কাব্যান্ধ, নিজেদের বিচার করবার শক্তি না থাকায় ফরমুলার সন্ধানে থাকে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেইজন্য ফরমুলার বড় আদর। রবীন্দ্রনাথ মিস্‌টিক (কাব্যে মিস্‌টিসিজম সোনার পাথরবাটি), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছান্দসিক, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলির মূল্য অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে যে সে মূল্য দিয়ে তার চূড়ান্ত বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত বাঙালী রচিত সব চেয়ে সুপরিচিত গান। কিন্তু গানটিকে কি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূল্য বিচারের কষ্টি-

পাথর রূপে ব্যবহার করা উচিত? বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলি নজরুলের সাহিত্যমূল্য বিচারের কষ্টিপাথর নয়। তবে কিনা সাহিত্যের বাজারে সকলে তো মূল্যবিচারের উদ্দেশ্যে যায় না; নানা কারণে যায়—যার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত পরোক্ষ।

নজরুলের যে সব গুণগ্রাহী ও অনুরাগী এখনো বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের আশায় অন্য কবিতাগুলিকে আড়ালে ফেলে রাখেন তাঁরা আর যাই হোন কবির যথার্থ বন্ধু নন। রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনে যে-সব কবিতা লিখিত হয়েছিল তার প্রাপ্য সম্মান ও খ্যাতি কবি লাভ করেছেন। তবে তা লাভ করেছেন একটা বিশেষ কালের হাত থেকে। তারপরে অর্ধ শতাব্দী প্রায় গত হয়েছে এখন দেখা উচিত কবি যাতে পরবর্তী কালের, যা নাকি চিরকালের অগ্রদূত, হাত থেকে কবি স্থায়ী সম্মান লাভ করতে পারেন। কবি এখন জীবন্মৃত, আমাদের মধ্যে বাস ক'রেও যেন নেই। তিনি সক্রিয় ও সতেজ থাকলে কি বলতেন জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভাল লাগে যে রূঢ় দেশাত্মবোধক উন্মাদনার উর্ধ্বে উন্নীত হতেন, সমকালের সাধনাকে চিরকালের অভিমুখে প্রেরিত করতেন। এই বিশ্বাসের সমর্থনের হেতু তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে আছে। নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা নয়—ভক্তি ও প্রেমের কবিতা ও গান, যার অনেকগুলিই বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। তবে যে আমরা এখনো উন্মাদনার কবিতাগুলো নিয়ে মাতামাতি করছি তার কারণ অদ্যাবধি আমরা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছি, কবি এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ও আমাদের মধ্যে কম ক'রে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি বহু কবি সাময়িক প্রয়োজনে স্বদেশী গান রচনা করেছেন; সাময়িক প্রয়োজন মিটে গেলেও যদি তাদের মূল্য থাকে তবে তা সাহিত্য মূল্য। সেই ক্ষয়িত সাহিত্য মূল্য দিয়েই কি তাঁদের বিচার করতে হবে? নজরুলের অনেক স্বদেশী গান ও কবিতার কিছু সাহিত্য মূল্য অবশিষ্ট আছে। সেই ক্ষয়াবশিষ্ট মূল্য দিয়েই কি আমরা কবির প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে

তাঁর প্রতি দায়িত্ব শোধ করতে চাই? আশঙ্কা হচ্ছে সাহিত্য বিচারের মধ্যে রাজনীতির স্থূল হস্ত প্রবিষ্ট হওয়াতেই এনন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা এই কাজটিতে নেমেছেন, জানেন যে কবির বাধ্যতামূলক নীরবতা। কাজেই তাঁরা নিজেরাই উতোর চাপানের ভার নিয়েছেন। কবির পক্ষে অবস্থাগতিকে—অন্যে সবাই কইবে কথা তুমি রইবে নিরুত্তর। অসহায় কবিকে নিয়ে সাহিত্য বিচারের নামে যারা সঙ্কীর্ণ রাজনীতির খেলায় মেতেছেন, তাঁরা না কবির অনুরাগী না সাহিত্যের।

—প্রমথনাথ বিশী

অপরিমেয়

নজরুল সম্বন্ধে লিখতে গেলে বিশেষ কোন একটি সময়ের বিশেষ কোন একটি ঘটনা দিয়ে আমার মনের ছবি ও ধারণা স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব নয়।

নজরুল সেই বিরল অসামান্যদের একজন যাদের ঠিক একটা ছাপা চেহারায় চেনা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে অমূল্য হীরে জহরতের মত ভিন্ন ভিন্ন কাটা পল থেকে তাদের ব্যক্তিত্বের আর চরিত্রের নানান রঙের বিচ্ছুরণ আমাদের চমকে দেয়।

নজরুলকে বুঝতে ও বোঝাতে তাই ছায়াছবির একটি কৌশলই ধার করতে হয়। কৌশলটির নাম হ'ল 'মনটাজ'। জন্মসূত্রে বিদেশী হলেও শব্দটা আমাদের ভাষায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

নজরুলের কথা স্মরণ করতে গেলে প্রথমে শুধু চোখে দেখা ছবিই মনের ভেতর ভেসে ওঠে না। তার বদলে কানে শোনা কিছু গুজব আর এখানে সেখানে কাগজে পড়া কিছু লেখার আলোড়ন থেকে উথলে ওঠা একটা উত্তেজনার ঢেউএর কথাই মনে পড়ে।

নজরুলকে তখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু কিশোর তরুণদের জানতে তার নাম যে উৎসুক স্পন্দন তুলেছে তা আমার মধ্যেও তখন সঞ্চারিত।

নানান দিক থেকে শোনা নানান খবর! কে এই নজরুল? বাংলা দেশের বীর্য আর পৌরুষের প্রমাণ যারা সন্থ সন্থ দিয়ে এসেছে সিরিয়া মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গনে, সেই সৈনিকদের নাকি একজন! কি করে সে? থাকে কোথায়? কোথায় থাকে তার সঠিক কোন ঠিকানা নেই। যখন যেখানে মাথার ওপর একটা ছাউনি জুটে যায় থাকে সেইখানেই। আর কাজের মধ্যে শুধু গান গায় আর আগুন-ঝরা কলমে কবিতা লেখে।

সত্য-মিথ্যায় মিলে এক আশ্চর্য রহস্যমণ্ডলে ঘেরা নজরুল ইসলামের নাম তখন আমাদের মুখে মুখে ফিরছে। 'ধূমকেতু' নামে কাগজটা সেই রোমাঞ্চিত সচেতনতাকে তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলছে হপ্তায় হপ্তায়। ধূমকেতু একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ত নয় বিদ্রোহী দুরন্ত যৌবনের জয়পতাকা। তার উচ্ছ্বাস-আস্ফালনের সাহিত্যমূল্য বিচার করবার ক্ষমতা তখন নেই, গরজও ছিল না। বাংলা দেশের থমথমে গুমোটের হাওয়া একটা বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করছিল, 'ধূমকেতু' তার বহ্নিপুচ্ছ সঞ্চালনে সেই বিস্ফোরণকে দিয়ে গেছে।

ধূমকেতুর চমক যত বেশী পরমায়ু তত কম। সে কাগজ একদিন তখনকার রাজশক্তির দাপটে বন্ধ হয়ে গেল। কাগজ লুপ্ত হলেও নজরুল ইসলামের জ্বলন্ত নাম তাতে স্তিমিত হয়নি। ধূমকেতুর জন্যেই রাজরোষে সে তখন জেলে। কিন্তু জেলখানার দেয়াল আড়াল করার বদলে নজরুলের খ্যাতির চূড়া যেন আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

কারাগারে তার আমৃত্যু অনশনের সঙ্কল্প সমস্ত বাংলা দেশকে যে উদ্বিগ্ন আকুলতায় অস্থির করে তুলেছিল, ইতিপূর্বে কোন কবি সাহিত্যিকের ভাগ্যে দেশের মনে সে-রকম আবেগের দোলা লাগাবার সুযোগ বোধহয় ঘটেনি।

নজরুল তারপর মুক্তি পেয়েছে কারাগার থেকে। তখনকার ও এখনকার দিনের পক্ষেও কঠিন সামাজিক-সংসার-ভাঙা তার অত্যন্ত দুঃসাহসী বিবাহের খবরও দেশময় তখন আলোচিত হচ্ছে। তার রচনার অনুরাগীরা যেমন অগণন ও উচ্ছ্বসিত, তার বিপক্ষ কিছু সমালোচকও তেমনি শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নির্মম। এই মানসিক

আবেগের মধ্যে নজরুল ইসলাম তখনই বাংলার এক জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে।

এই কিংবদন্তীকে তারপর চাক্ষুষ দেখার ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাবার সুযোগ হয়েছে। তাতে তার চারিদিকের সেই তারুণ্যের মোহে আরোপিত রহস্যমণ্ডল মিলিয়ে গিয়ে কিংবদন্তী-সত্তার সব চটক খসে গেছে কি?

যায়নি একেবারেই। বার বার নানাভাবে তার সান্নিধ্যে এসে তার বিচিত্র ব্যক্তিত্বের নতুন নতুন উদ্ভাসেই মুগ্ধ বিহ্বল হতে হয়েছে, অত্যন্ত কাছে পেলেও তার ভেতরকার একটি অনধিগম্য উত্তুঙ্গতা তাকে সুদূর করে রেখেছে।

প্রথম দেখা নৈহাটি রেলের পোলের ধারের রাস্তায়। আর সব ভুলে গেছি শুধু হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরেই বাসন্তী রঙের একটা ঝলকের ছবি মনে যেন ছাপা হয়ে আছে। নজরুল তখন থাকে হুগলীতে, দেখা করতে এসেছে আমাদের সঙ্গে এপারে। বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি আর উত্তরীয় ব্যবহার তার তখন থেকেই শুরু হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল এ রঙ যেন জন্মসূত্রে তার সঙ্গে জড়ানো। হাসি গান আর চিৎকার, যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি উদ্দাম। শ্রান্তি-ক্লান্তি তাতে নেই। রক্তমাংসের সাধারণ একটা মানুষ নয়, আশ্চর্য আতসবাজির মত হৃদয়ের খুশির রঙ আর আগুনের ফুলকির একটা জীবন্ত অফুরন্ত ফোয়ারা।

এই মানুষকেই চুপি চুপি যেন চোরের মত এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেমেয়ের হাতে গোপনে কিছু রঙীন খেলনা আর টাকা দিয়ে পালিয়ে আসতে দেখেছি। বন্ধুর বাড়িতে তখন শোকের ছায়া। ছেলেমেয়েগুলি মাতৃহারা হয়েছে সবে। নজরুল মামুলী সান্ত্বনার বাণী শোনায়নি, বন্ধুকে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি, শুধু লুকিয়ে তার ছেলেমেয়েকে দেখে এসেছে, নিজের মমতার গভীরতায় যেন লজ্জিত হয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। এক ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে একটি ছবির জন্য নজরুলকে সঙ্গীত পরিচালনার ভার

দেবার ব্যাপারে মধ্যস্থ হতে হয়েছে। সেই সময়কার একটি দিনের কথা ভোলবার নয়। নজরুলের যোগসাধনার কথা অনেকেই জানতেন বলে এখন শুনি। আমি কিছুই জানতাম না। অনধিকারী বলেই হয়ত নজরুল অন্তরঙ্গতার ভেতরেও কোনদিন তার আভাস দেয়নি। সেদিন হঠাৎ দিয়েছিল। ফিল্ম-স্টুডিওর মধ্যে প্রকাণ্ড একটি লম্বা ঝিলের এক প্রান্তে মার্বেলের কয়েকটি আসন। সন্ধ্যার দিকে আমরা ক'জন সেখানে গিয়ে বসেছি। নজরুল সেদিন এসেছে তারই সুর দেওয়া কটি গান শুনিয়ে যেতে। নজরুল যেখানে থাকে সেখানে সে-ই স্বতঃসিদ্ধভাবে আসরের মধ্যমণি। সে প্রাধান্যের জন্যে তাকে চেষ্টা করতে হয় না। জোর করে কৃত্রিম মনোযোগ আদায় করতে হয় না খ্যাতি-প্রতিপত্তির জমকে। আপনা থেকেই সকলের মুগ্ধ তন্ময়তার চুম্বক-কেন্দ্র হয়ে সে সমাবেশ জমিয়ে রাখে।

সেদিনও সে তাই রেখেছিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। কম-বেশী পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ওই অঞ্চল সূর্য ডুবতে না ডুবতেই প্রায় জনমানবহীন হয়ে যেত। রাস্তায় কদাচিৎ একটি-আধটি গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যেত। লোকচলাচল ছিল প্রায় ওই রকমই বিরল।

আসর মাতানো কি যেন একটা গল্পের শেষে তার নিজস্ব প্রাণখোলা হাসিতে চারিদিকের নির্জনতা কাঁপিয়ে তুলতে তুলতে হঠাৎ নজরুল থেমে গিয়েছিল। তারপর একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল,—কে আসছে না?

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা তখন দূরে স্টুডিও-র পূর্বপ্রান্তের বিরাট তোরণের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। অন্ধকার হলেও সেই গেটের দিক থেকে বেশ একটু দীর্ঘচেহারার একটি লোককে দেখা যাচ্ছে।

কাছে আসবার পর লোকটি একেবারে অচেনা দেখে আমরা একটু বিস্মিত হয়েছি। তখনকার দিনে আর কিছু না থাক স্টুডিওর চালটা ছিল আমিরী। গেটে সারাক্ষণ বন্দুকধারী পাহারাদার

খাড়া। সেই পাহারাদারের দৃষ্টি এড়িয়ে বা সম্মতি নিয়ে অচেনা একজনের স্টুডিওতে ঢোকাটাই একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার।

লোকটির কথাবার্তায় চালচলনে বিস্মিত কৌতুকই অনুভব করেছি তারপর। দু-চারটে কথাতেই, মানুষটি যে অপ্রকৃতিস্থ তা বুঝতে দেরি হয়নি। আবোল-তাবোল দু-চারটে কথার পর লোকটি নজরুলের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছে। এতদিন বাদে যথাযথভাবে তার সে প্রলাপ-জাতীয় কথা স্মরণ করতে পারব না, তবে নজরুলের বাসন্তী রঙের পোশাক সম্বন্ধে সে যেন কি সব এলোমেলো কথার মধ্যে এ রঙ কখনো ছাড়তে নিষেধ করেছিল বলে মনে আছে।

কর্তাদের ইঙ্গিতে এই অবাঞ্ছিত উপদ্রবকে স্টুডিও থেকে দূর করবার জন্যে দু-চারজন অনুচর দারোয়ান তখন রক্তচক্ষু দেখিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নজরুল কিন্তু কাউকে লোকটির ওপর এতটুকু জুলুম করতে দেয়নি। আমাদের সকলকে ইশারায় সঙ্গে আসতে মানা করে। নিজেই তাকে হাতে ধরে অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত আলাপ করতে করতে স্টুডিও থেকে বার হবার গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে।

বিকৃত-মস্তিষ্ক একজন হতভাগ্যের প্রতি স্বাভাবিক মমতা বলে যা মনে হয় তা তার চেয়ে কিছু বেশী বলেই তারপর ধারণা হয়েছে।

নজরুল ফিরে আসার পর অবাক হয়ে একটু পরিহাসের সুরেই বলেছিলাম, – একেবারে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলে! তোমার এই খাতিরের লোভেই স্টুডিওতে এখন পাগলের ভিড় না বেড়ে যায়!

নজরুল কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তার পক্ষে অস্বাভাবিক প্রায় অস্পষ্ট চাপা গলায় বলেছিল,—ও পাগল নয়, যোগভ্রষ্ট।

ঘটনা, ছবি এমন আরো অনেক।

নির্লোভ নির্লিপ্ত সদাপ্রসন্ন নজরুল দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসে যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছে ছোট শিশুর মত একটা খেলনার জন্যে। খেলনা হল মোটরগাড়ি। মোটরগাড়ি তাকে কিনতেই হবে যেমন

করে হোক। অনেক টাকা চাই? কুছ পরোয়া নেই। নাম-করা সব বইএর কপিরাইট অকাতরে সে বিলিয়ে দিলে একটা মোটর-গাড়ি কেনার ঝোঁকে।

মোটরগাড়ি তারপর কেনা হ'ল। তাই চড়েই কি সে বেড়ায় রাতদিন? সময় কোথায়? মোটর চড়ার শখ তার ছেলেবেলা থেকে। সেই শখই মেটায় কিন্তু বাঁধা পড়ে না আসক্তিতে। মোটর পড়ে থাকে রাস্তায়, নজরুল সাড়ে তিন হাত চওড়া একটা সঙ্কীর্ণ লম্বা দোকানঘরের মেঝেয় কাগজপত্রের জঞ্জালের মধ্যে প্রায় দিনরাত বসে বসে দাবাখেলায় মগ্ন। গান নয় কবিতাও নয়, শুধু দাবার চালই ধ্যানজ্ঞান। রসদ শুধু চা আর পান।

আরেক নজরুল সহসা একদিন এসে উদয় হয়েছে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে বেশ কয়েক মাস একরকম অজ্ঞাতবাসের পর।

দুদিনের জন্যে একটা ডেরা চাই। মনের মধ্যে কবিতার বন্যা এসেছে, একটু নিভৃত অবসর আর আশ্রয় দরকার সেগুলো কাগজের ওপর নামিয়ে দেবার জন্যে।

শৈলজানন্দ ভবানীপুরে একটি গলির মধ্যে ছোট একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকে। তারই একটি দোতলার ঘরে নজরুল যেন নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করলে। দুদিন বাইরের কেউ তার মুখও দেখতে পেল না। দুদিন বাদে কবিতায় ঠাসা একতাড়া কাগজ নিয়ে নজরুল বেরিয়ে এল। 'কালিকলমে' মাসের পর মাস সে কবিতা ছাপা হয়েও উদ্বৃত্ত যা রইলো তা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল আরো অনেক পত্রিকা।

আসল নজরুল এই সব বিচিত্র প্রকাশের বিশেষ কোন একটি কি? না, এই মত সব ক'টির যোগফল?

না যোগফলও নয়, তার চেয়ে বেশী, অপরিমেয় কিছু!

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

তারেই খুঁজে বেড়াই

কবি বিভিন্ন মেজাজে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

কবিতা ভাবপ্রধান সত্য, কিন্তু কখনো কবিতা আখ্যানরূপ ধারণ করে থাকে। কখনও কবিতা হয়ে ওঠে উপন্যাস, ক্রমবিকাশে গল্পের মর্মবাণী ধরিয়ে দেয়।

বোদ্ধা হাসেন, মনে মনে বুঝে নিতে পারেন কোন্ সুগুপ্ত ভাব-ধারার বিন্যাস তিনি এখানে ধরতে পারছেন। কি অলিখিত তথ্য রয়েছে নিহিত পংক্তিসমূহের অন্তরালে।

নজরুল ইসলাম কবিসত্তায় বিভিন্ন মেজাজী। তন্মধ্যে রাজনীতি ও সামাজিক দিকগুলি বর্জনান্তে অতি প্রকট তিনি প্রেমের কবি রূপে।

(কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রথম চিন্তায় কবি উদিত হন 'বিদ্রোহের কবি' বলে) অজস্র প্রেমের কবিতায় কবি প্রেয়সীর বন্দনা করেছেন, কিন্তু 'অগ্নিবীণা'য় কবি তাঁর বহ্নিমান সত্তাকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, অন্য কবিতায়, বিশেষতঃ প্রেমের কবিতার প্রকাশের সঙ্গে মেলে না।

তবু হাবিলদার নজরুল, বিদ্রোহী নজরুল, দেশপ্রেমিক নজরুল অতি কোমলতায় ধরা দিয়েছেন কোনও প্রেমিকার কাছে।

নারী নজরুল-কাব্যে বিভিন্ন রূপে এসেছে, তবু কবির মনোনয়নের মাত্রা দেখে ধরা যায় একটি সামগ্রিক ছবি।

কিন্তু সমস্ত নজরুল-কাব্যের ধ্যান যে নারী, সে ধরা দেয় না। স্বপ্নসমাচ্ছন্ন অতি সুকুমার উপস্থিতি তার। কবির গানে সে কখনও দেখা দেয়, কখনও কবিতায় সে কেঁদে বেড়ায়। আবার সে সুদূরপ্রিয়া, অন্তর্হিতা। কবি ভিড়ের মধ্যে 'চেনা কমল-পা' খুঁজে বেড়ান। ঊর্ধ্বলোকের ধ্যানে উন্মাদ-বিহ্বল যৌবনের দিনগুলি কখনও বা সন্ন্যাসী হয়ে যায়। এই রহস্যময়ী অধরা প্রিয়াই নজরুলের নারী।

কবি বলেন :—

"ওগো আমার আড়াল-থাকা, ওগো স্বপন চোর,
তুমি আছ—আমি আছি—এই ত খুশি মোর।
কোথায় আছ, কেমন রাণী,
কাজ কি খোঁজে, নাই বা জানি!
ভালবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাই'না জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।"
('গোপনপ্রিয়া')

অথবা 'বাতায়ন-পাশে গুবাকে তরুর সারি' কবিতায় বলেন :—

"সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-মল
—বলো তাহে কার ক্ষতি?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!"

আমেরিকান সেনেটর টমাস বেণ্টন তাঁর জামাতার বিষয়ে কন্যা জেসীকে একদা বলেছিলেন—"Your husband's idealism is a luxury to me."

নজরুলীয় প্রেমের উক্ত প্রকৃতির আদর্শবাদ আমাদের অনেকের কাছে সেনেটর বেণ্টন বর্ণিত 'বিলাস' বলে মনে হ'তে পারে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই আদর্শবাদ কাজী নজরুল আপন কবিজীবনের এই বিশিষ্ট ঘটনা থেকে উদ্ভূত, অতএব অকৃত্রিম—এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তেই বলা যায়।

আজ নজরুল ইসলামের কাব্যজীবনের উৎস সন্ধানে আমরা তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। প্রথম জীবনের বাগ্‌দত্তা প্রেয়সীকে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য কবি দূরেই রেখেছিলেন আজীবন। সে বিবাহ সিদ্ধ হয়নি।

"বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটলো যামিনী
অবেলাতেই পড়ল ঝরে কোলের কামিনী—
ও যে শিথিল কামিনী।"

সকরুণ বেদনায় কবি 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় বলেন—

"করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হতে তোর,
ভেবেছিলাম গাঁথব মালা—পাইনি খুঁজে ডোর।'

পরবর্তী জীবনে অন্য সার্থক প্রেম পরিণয়ে ধরা দিলেও কবির প্রথম প্রেমের নায়িকা অধরা।

অধরা কেন?

পূর্ব ও প্রথম প্রেম নার্গিস নজরুলের চেতনার দূতী শুধু হননি। কবিবন্ধু আলি আকবরের ভাগ্নী হিসাবে পরিচয়ের পরিধির অন্তরঙ্গ পরিবেশে' অহোরাত্র ধরা দিয়েছিলেন। প্রথম প্রেমের চটুলতায় কবি লিখলেন ঃ—

"নার্গিস বাগানে বাহার কি আগমে
ভরা দিল দাগমে—" ইত্যাদি

কিন্তু পরিণাম নিরাশা।

দৌলতপুরে যে দৌলৎ নজরুল কুড়িয়ে পান তাকে ছেড়ে আসতে হলই। কারণ ঘরজামাতা থাকতে হবে, পত্নীকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবেন না। কবিকে আবদ্ধ রাখার এই ষড়যন্ত্রের হোতা আলি আকবর। তিনি, পূর্বেই বলেছি, নিকট বন্ধু ও ভাবী পত্নীর মামা। বিয়েতে বরযাত্রীর দলে ভরে গেছে বাড়ি, মজলিসে বসে বিয়ের চুক্তি হয়েছে, কাবিন-নামা হয়ে গেছে। কিন্তু চিরমুক্ত বিদ্রোহী কবিকে কেবলমাত্র প্রেমের বন্ধনে, স্নেহের বন্ধনেই বাঁধা যায়। জোর সেখানে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে। তাই সেই রাত্রে, গোপনে নজরুল ইসলাম পালিয়ে এলেন। প্রেয়সী ঘরের গৃহিণী হল না, সুদূর প্রিয়া হয়ে রইল আজীবন।

এখানে নজরুলমানসের এক বিশিষ্ট মানসিকতা পরিলক্ষিত। খুঁজে বেড়ানোর মনোবিলাসটুকু সযত্নে লালন করার অভিপ্রায়েই বোধ হয় কবি মানসীকে পথের ধূলায় ফেলে এলেন। 'ক্ষ্যাপা'র পরশপাথর অজ্ঞাতসারে হস্তচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞানপাপী যিনি তাঁকে বিশ্লেষণের বা বর্ণনার প্রয়াস সুকঠিন। তিনি পলায়নী সত্তা।

এই পলায়নের পেছনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মানের প্রশ্ন

ছাড়াও আছে আশঙ্কা। বাস্তবকে মুখোমুখি দেখার ভয়। বিবাহ সম্পাদিত হ'বার পরে কি পন্থা নির্ণয় করা যেত না? সংগ্রামের মধ্যে কী মুক্তি মিলত না? পৃথ্বীরাজ যদি জয়চন্দ্রের মহতী স্বয়ংবর সভা থেকে সংযুক্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে বীরযোদ্ধা যিনি কবি হয়েও মেসোপটেমিয়ায় সৈন্য সাজতে দ্বিধা করেননি, তিনি কি পারতেন না প্রিয়াকে গণ্ডীর বাইরে নিয়ে আসতে?

তবে নিরর্থক হয়েছে কলমে এই লাইনগুলি :—

"আমি হরিয়া আনিব বিষ্ণুবক্ষ হইতে যুগল কন্যা—"

বিষ্ণুবক্ষ কেন, সাধারণ গৃহস্থবাড়ি থেকে একটি কন্যাকেই তিনি হরণ করে আনতে পারেননি। বিদ্রোহী বীর অন্য ধর্মে অপরা এক নারীর পাণিগ্রহণের পর জীবনে 'দোলনচাঁপা' ফুটিয়ে বাগদত্তা পত্নীর উদ্দেশে সারাজীবন হাহুতাশে কবিতা লিখে কাটালেন।

বহুশ্রুত, অতি প্রসিদ্ধ গানটি শুনি নজরুলের :—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার!"

তখন মনে হয় যিনি অন্যদের এবম্বিধ কৃচ্ছ্রসাধনে তৎপর হ'তে আহ্বান জানাচ্ছেন, তিনি নিজে এমন পরাভূত কেন?

অবশ্য নার্গিসের সঙ্গে বিবাহের শর্ত ছিল লিখিত, আইন ছিল। কিন্তু কিশোরী নার্গিসের সঙ্গে অত প্রেমের পরে, পূর্বরাগের পরে, বিবাহের কথা দেবার পরেও যিনি একজন মহিলাকে লজ্জা-অসম্মানের মধ্যে ফেলে সহসা পালাতে পারেন, তিনি কথার আইনগত বা লিপিগত মূল্য রাখার পক্ষপাতী কেন? ভাঙা যেত না কি? প্রাপ্ত-বয়স্কা নার্গিস, বিবাহের পূর্বে এক বাড়িতে মামার বন্ধু হিসাবে অবস্থানের ফলে পরিচিতা ও প্রেমে বিগলিতা। কবি নার্গিসের সঙ্গে ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করতে পারতেন না কি? কত লোক ছিল দৌলৎপুরে, আলি আকবর কত আর এমন শক্তিধর ছিলেন?

কবি উপদেশ দিয়েছেন তাঁর অগ্নিজ্বালা রাজনীতির রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে :—

"কারার ওই লৌহকবাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট,
রক্তজমাট
শিকলপূজার পাষাণবেদী……
…লাথি মার ভাঙ রে তালা,
যত ওই বন্দীশালা
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা,
ফেল উপাড়ি—"

—তবে কবি, তুমি সারাজীবন নিরপরাধ কন্যা নার্গিসকে চির-অনূঢ়ত্বের বোঝা টানালে কেন, বল ?

বিদ্রোহে অভ্যস্ত কবি, 'নবযুগে'র পাতায় তাঁর শঙ্কা দেখা যায়নি। রাজদ্রোহে, কারাগারে, আমরণ অনশনে, কোন কিছুতে পিছপা ছিলেন না। প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপক্ষে যাঁর জেহাদ, সামান্য দৌলৎপুরের লোককে তাঁর ভয় কেন ? পরেও তো তিনি প্রেয়সীকে ছিনিয়ে আনতে পারতেন সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে উপেক্ষা করে ?

কবির অন্তরঙ্গ মহলে এ বিষয়ে কারণ জানা থাকলেও হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের এটি সোচ্চার প্রশ্ন।

নাকি 'দোলনচাঁপা' অন্য কিশোরীর স্নেহপ্রলাপে বিস্মরণের পলি পড়েছিল ? বেশী প্রয়াস করতে হয়নি ; কবির পরিবর্তনকামী প্রেমজীবনে যে ধরা দিল, সেই ব্যথা উপশমের পাত্রী হল তৎক্ষণাৎ।

নাকি তখন নার্গিস ভীরু ছিলেন ?

"আমি জানি, ভীরু, কিসের এ বিস্ময় !
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া
নিজেরি করে যে ভয়—" ('ভীরু')

কবি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে প্রবেশে ভয় পেয়েছিলেন নিশ্চয়। আপনা থেকে যদি হয়ে যেত অনায়াসে, অপরপক্ষের জোর দাবিতে, তিনি আত্মসমর্পণ করতেন। কিন্তু প্রয়াস যেখানে প্রয়োজন, সেখানে দ্বিধার চিহ্নমাত্র পরম এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় যে।

নার্গিসের সঙ্গে চিরকাল এই শঙ্কা জড়ানো ছিল। সেনেটর বেণ্টনের বর্ণিত 'বিলাস' মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নার্গিসকে লিখিত পত্রগুলি পাওয়া গেছে। পরবর্তী জীবনে কবি তাঁকে চোখে দেখতেও চান না, কেন না—

—"দেখা? নাই হ'ল এ ধূলির ধরায়। প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী।"...

"—আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ, তাই তাকে পেতে চাইনে।"....

নজরুল এই প্রেমকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন, পূর্বেই বলেছি। সুপ্রচুর দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে।

"দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন রোল!
কূল মেলে না, তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ দোল!"
('গোপনপ্রিয়া')

কবি বলেছেন, "পাইনি বলে আজও তোমায় বাসছি ভালো, রাণী"—

এ কথা সত্য। যাকে পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে সে হয় নিঃশেষিত প্রত্যাশার ভাণ্ডারে। অপ্রাপণীয়ারই মাদক অধিক। কিন্তু, তাই বলে 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মত সযত্ন-রচিত বিরহসৃজন কাব্যলোকের বস্তু। ভাবমিলনকে প্রাত্যহিক জগতে মিলন নামের স্বীকৃতি দেয় কয়জন?

একনজরে নজরুলের 'শিউলিমালা' গল্পটি দেখা যাক। গল্পটি বেছে নিয়ে দেখবার কারণ এই যে উক্ত কাহিনীর মধ্যেই সমগ্র নজরুলকাব্যের নারীর একটি চিরন্তনী আদর্শমূর্তি ও প্রেমের আদর্শ রূপ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কবিতা ও গানের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে এই রূপটি।

'শিউলিমালা'র নায়ক আজহার একজন সুযোগ্য পুরুষ হয়েও সারা জীবন অবিবাহিত কাটিয়ে দিলেন। কেন? না, প্রথম যৌবনে 'শিউলি' নামের একটি মেয়েকে তিনি ভালোবাসেন। নামকরা তরুণ ব্যারিস্টার, বিখ্যাত দাবা খেলোয়াড় ধনী আজহার প্রতি

বৎসর পয়লা আশ্বিন শিউলি ফুলের মালা জলে ভাসান আর পূর্ব প্রেমের ধ্যান সারা বৎসর ধরে করে থাকেন। এই স্বেচ্ছাআরোপিত বিচিত্র ও ভাবপ্রবণ বিরহ 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র পরে আর দেখা যায় কি? কিন্তু কেন, কেন? শেষ পংক্তি কয়েকটি পড়া যাক—

"আর তার সাথে দেখা হয়নি—হবেও না। একটু হাত বাড়ালেই হয়তো তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলিফুল—বড় মৃদু, বড় ভীরু, গলায় পরলে দুদণ্ডে আঁউড়ে যায়"—

বাস্তবজীবনে 'শিউলিমালা' নজরুল ভাসাননি, অবশ্য যদি কবিতাকে শিউলিমালা রূপকে আরোপিত না করা হয়। কিন্তু বঞ্চিতা, নিঃসঙ্গ, চিরকুমারী নার্গিস হয়তো চোখের জলে মালা গেঁথেছিলেন অনেক।

শেষ জীবনে নার্গিস সাক্ষাতের বাসনা জানালেও কবি সেই বাসনা পূর্ণ করেননি।

কেন? অভিমান? মনোবিলাস? আশঙ্কা? নার্গিসের প্রেমকে নজরুল কাব্যে স্থান দিয়েছেন। আদর্শবাদের নজিরে অনেকের কাছে এমন অপার্থিব ভাবধারা অপূর্ব। কিন্তু জেসীর ভাষায় বলি :—

"The overdose of idealism, like a too rich pastry leaves a slightly sickish sweet taste in one's mouth." (Immortal Wife—Irving Stone).

নার্গিস-এপিসোড নজরুলজীবনে তাই। প্রেমে বঙ্কিম-পথ ও ব্যতিক্রমের অবকাশ ছিল কবির বন্ধনহীন জীবনস্বাদের মধ্যে। কবিকে নীতিবাগীশ বলতে শুনিনি কখনও। কিন্তু শঙ্কা নার্গিসের নামে মিশেছে। এস্কেপিজম্ কবিমনের স্বাভাবিক বৃত্তি। নার্গিসের পনেরো বছর পরের চিঠিতে সমস্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেও একবার দেখা হওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে কি—এস্কেপিজম্, আদর্শবাদ, অভিমান না আতঙ্ক?

কেউ কারুর জীবন নষ্ট করতে পারে না। চরিত্রগত দুর্বলতা বা সামঞ্জস্যের অভাবে ব্যর্থ জীবনকে কোন উপলক্ষ্য বা অজুহাত ধরে

আমরা সম্পর্কিত ব্যক্তিকে দোষ দেই। যদি নার্গিসের জীবন ব্যর্থ হয়ে থাকে নিজের জন্যই হয়েছে। নজরুলকে দোষ দেওয়া যায় না। তবু উভয়ের চিত্তে এক ফিক্সেশন্ কাজ করেছে; নজরুলের ক্ষেত্রে একজনকে বার বার খোঁজা ঃ—

"ওপার হ'তে ছায়াতরু! দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি।"

তবু নজরুল এই বঞ্চিতা নারীর পনেরো বৎসরের সাহস-সঞ্চয়প্রসূ প্রেমনিবেদনকে আরও একটু সহানুভূতি দিয়ে দেখতে পারতেন।

পূর্বেই বলেছি বিবাহসভায় পলাতক বর নিজের কর্মকে জাস্টিফাই করলেন ঃ—

"আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ—"

অথচ আবার নার্গিসকে লেখা—

"আমি জানি সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয়বেদীতে অনন্ত প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।....জীবনভরে সেখানেই চলেছে আমার পূজা—আরতি!"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নজরুলজীবনী "জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে" বলেছেন ঃ— "নজরুলের এই প্রেমপত্র বাংলাসাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি।"

আমরা মনে করি এই অনবদ্য সৃষ্টি কেবল সাহিত্যজগতেরি একান্ত সম্পদ। বাস্তবে তারা এক পলায়নী মনোবৃত্তিসঞ্জাত বিচিত্র বস্তু মাত্র। নারী সম্পর্কে কবির এক ঘোর আদর্শবাদী অথচ দুর্বোধ্য মনোভাব বোঝা যায়। যেন কেবল ভালবাসবার জন্যই মানসীকে সযত্নে সরিয়ে রাখা। কাছে এলে প্রত্যহের ঘাতপ্রতিঘাতে যদি মালিন্য ধরে প্রেমে, তাই বুঝি কবিতাকে কাছে আনেননি ভয়ে।

ব্রাউনিং-এর 'Porphyria's Lover' কবিতায় ঠিক এই মনোভাব দেখি। কিন্তু প্রকৃত প্রেমের শক্তি মোহভঙ্গের ভয় রাখে না, এক মুহূর্তের প্রেমের ঊর্ধ্বগতির পরেও আবার সেই উচ্চতা প্রাপ্তিরই আশা রাখে। পরফিরিয়ার প্রেমিকের চেতনা লুপ্ত হয়েছিল বিহ্বলতায়। নজরুলের পরবর্তী জীবন দেখলেই বোঝা যায় কেন দু'জনের মধ্যে মিল আছে।

কবিতা লেখার উদ্দেশ্যে সযত্নরচিত বিরহ স্বার্থপরতা নয় কি? কবির জীবনে যে-সকল নারী পদার্পণ করেছিলেন, তাঁরাই বলতে পারবেন নারীর সম্বন্ধে কবির ভাবধারার মধ্যে সত্যই কতটা স্বার্থপরতা ছিল, কিম্বা ছিল নাকি প্রথম থেকেই! জটিল কবিচিত্তকে ধরা সহজ নয়।

কবি অধরা মানসীকে খুঁজে বেড়িয়েছেন, আমরা খুঁজি কবির বিচিত্র মানসিকতার প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া-কলাপ।

—শ্রীমতী বাণী রায়

জন্মদিনে

তোমার অনেক রূপ স্মৃতিতে বিধৃত
বলেই না হৃদয়ের হাহাকারে ভুগি;
ভুলে যাই জরামৃত্যু বয়সের ভার
যদি শুনি বাজিকর বাজায় ডুগডুগি।
একদা আগ্নেয়গিরি বহ্ন্যুৎসব শেষে
স্থির শান্ত অবিচল মৃত্যুর পাহাড়ঃ
সবিস্ময়ে বর্তমান যদিও তাকায়
অতীতের বুকে জাগে শুধু হাহাকার।
জীবনের স্রোত চলে উজান ভাঁটায়
মানুষের কবি শুধু নিস্পন্দ নীরবঃ
বিদ্রোহের বাণী যাঁর প্রেমের স্ফুরণ
বেঁচে থেকে লুপ্ত তাঁর কণ্ঠের বৈভব।
বেদনার্দ্র চিত্তে তাই আমরা সবাই
নজরুলের নিরাময় প্রতিদিন চাই।

—গোপাল ভৌমিক

উন্নত শির

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের হল্‌-ঘরে গান-বাজনার আসর। হলের ভেতরে দেদার লোক। এক-একজন নামকরা গায়ক আসছেন আর গান গাইছেন। শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারা নির্বিকার। এক-একজন গায়ক তো গান শেষ করবার সুযোগও পাচ্ছেন না। তার আগেই শ্রোতারা হাততালি দিয়ে তাঁদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।

এমন সময় ঘোষণা হলো—নজরুল ইসলাম তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিপুল আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর যতক্ষণ আবৃত্তি চললো ততক্ষণ আর কোথাও এতটুকু টুঁ-শব্দ নেই। বীর চললো শির উন্নত করে—

এই আমার প্রথম নজরুল দর্শন। আমার বয়েস তখন কুড়ি-বাইশ আর নজরুলের বোধ হয় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। সেই বয়সেই সুবিখ্যাত। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া রুক্ষ বাবরি চুল। গায়ে একটা গেরুয়া চাদর।

এর পর মেগাফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে। ছোটবেলায় আমার কোনও সাহিত্যিক বন্ধু ছিল না। বন্ধুরা সবাই ছিল গায়ক। গানের আসরেই দিন-রাত কেটে যায়। শচীন দেববর্মন, কুন্দনলাল সায়গল, অনুপম ঘটক, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস। ইউনিভার্সিটি ফেরতা চলে আসি অক্রুর দত্ত লেনের হিন্দুস্থান স্টুডিওতে। তারপর সেখান থেকে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে যার নাম মাঝরাত্তির। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ এলে তো কথাই নেই। অথচ স্টুডিওতে আমারও একটা ছোট্ট ভূমিকা আছে। আমি রেকর্ডের একটা দুটো গান লিখি।

অনিল বিশ্বাস হিন্দী গজল রেকর্ড করলো মেগাফোনে। তার সঙ্গে আড্ডা মারতেই সেখানে যাই।

একদিন সেখানে গিয়ে দেখি নজরুল এক আর্টিস্টকে গানের তালিম দিচ্ছেন। সামনে আর্টিস্ট ছাড়াও আরো দশ-বারোজন ভদ্রলোক। একবার গানের সুর শেখাচ্ছেন আর্টিস্টকে, আর একবার

সামনের একটা খাতার পাতায় গান লিখছেন। সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা নজরুলকে বরানগরে না শিবপুরে কোথায় নিয়ে যেতে এসেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি যে-গান গাইবেন সেই গানটাই তখন লেখা হচ্ছে। তখন মাত্র লেখা হচ্ছে, তারপর সুর দেওয়া হবে তাতে। আর তারপর তিনি সভায় গিয়ে সেটা গাইবেন। একাধারে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে চলেছে। একগাদা পান রয়েছে সামনের রেকাবিতে। এক-একবার পান মুখে পুরে দিচ্ছেন, আর পাশে রাখা পিক্‌দানিতে পিচ ফেলছেন।

এমন সময় কে একজন এসে জানালো অফিস ঘরে তাঁর টেলিফোন এসেছে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে চাদর সামলাতে সামলাতে সেদিকে চলে গেলেন।

মনে হলো বীর চলেছে শির উন্নত করে—

এর পর একেবারে আমাদের পাড়ায়। আমারই এক বন্ধুর বাড়িতে নজরুলের গানের আসর। আমরা সবাই ছুটলুম। একা নজরুল নয়। তাঁর সঙ্গে উমাপদ ভট্‌চার্যি আর নলিনীকান্ত সরকার। সন্ধ্যে থেকে আসর শুরু হলো। রাত যখন বারোটা তখন বাড়ি চলে এলাম। উমাপদ ভট্‌চার্যি আর নলিনীকান্ত সরকারও চলে গেলেন। কিন্তু নজরুল রয়ে গেলেন। শুধু সেই রাতটাই নয়। তারপর পনেরো দিন ধরে একটানা নজরুল সে-বাড়িতেই রয়ে গেলেন। অবিশ্রান্ত গান চলতে লাগলো। পনেরো দিন পরে বোধ হয় কেউ এসে স্মরণ করিয়ে দিলে যে এটা তার বাড়ি নয়, তখন তিনি হারমোনিয়ম সহ বিদায় নিলেন। বীর চললেন শির উন্নত করে—

এই শেষবার।

এর পর আমিই বা কোথায় আর নজরুলই বা কোথায়! গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর লেখা আর তাঁর সুর দেওয়া গান শোনা ছাড়া আর কোনও চাক্ষুষ সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া গানের জগৎ থেকে আমিও তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। বলতে গেলে কলকাতা শহর থেকেই তখন চির-বিদায় নিয়েছি। কিন্তু যখন আবার ফিরে

এলাম তখন যুগ বদলে গেছে। মাইক্রোফোন লাউড-স্পীকারের আবির্ভাব হয়েছে। সেই সায়গল, শচীন দেববর্মন, অনিল বিশ্বাস, অনুপম ঘটক, তাদের মধ্যে একজন আছে, তিনজন নেই। ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ সাহেব, তাঁরাও চলে গেছেন। আমারও এবার যাবার পালা।

কিন্তু বীর এখনও শির উন্নত করেই চলেছে—

প্রার্থনা করি যেন বীরের শির চির-উন্নতই থাকে।

—বিমল মিত্র

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

কথাসাহিত্য কাজী নজরুল সম্বন্ধে আমাকে কিছু লেখাব জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন কিন্তু কাজী নজরুল সম্বন্ধে এমন কোন নতুন কথা তাঁর কোন বন্ধুই শোনাতে পারবেন না যা তাঁব অনুরাগী পাঠকদের ধারণার বিপরীত মনে হবে। অর্থাৎ তাঁর রচনা ও জীবন একই ধারায় প্রবাহিত। তিনি যা ভাবতেন তা নিরঙ্কুশ ভাবে লিখতেন এবং যা লিখতেন—সেই মতে চলতেন।

সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের আগের কলকাতার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান কলকাতা তথা বাংলাদেশের বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে-যুগে রবীন্দ্রনাথেব পর্বে কয়েকজন কবি যাঁরা ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের তীব্র রশ্মিপাতে অনুজ্জ্বল হয়ে থাকতেন, কিন্তু তাঁরা কবি হিসেবে কম প্রতিভাশালী ছিলেন না— তবে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে কেউই যেতে পারেন নি। সেই সময় কাজী নজরুলের আবির্ভাব সকলকে সচকিত করে তুলেছিল, এটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার সঙ্গে নজরুলের কাব্যধারার পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। একেবারে ভিন্ন খাতের; বললে চলে।

রবীন্দ্রনাথ বিদগ্ধ মানসে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন তার তুলনা ছিল না, কিন্তু কাজী সাধারণ গণমানসে যে প্রভাব বিস্তার করে-

ছিলেন তারও তুলনা মেলে না। ইউরোপীয় কবিদের বা সমাজের বা সাহিত্যের কোন প্রভাব বা সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যপ্রভাব কাজী নজরুলের কাব্যে বা গানে পাওয়া যায় না—কিন্তু সে-যুগে বিপ্লবী বাঙালীর মনে আবেগ সঞ্চার করতে ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরশুরামের মত শাণিত কুঠার নিয়ে আক্রমণ করতে তিনি যেভাবে পদার্পণ করেছিলেন তা দেখে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান শুধু চমকিত হয়েই ওঠে নি—সে-সময় যথেষ্ট প্রেরণাও পেয়েছিল। এই দেশের মাটির কবি হিসেবে তিনি আবির্ভূত হয়ে উঠেছিলেন। ইন্‌তেলেকচুয়াল সমাজে বা আভাঁন্ত গার্দ সাহিত্য সমাজে তিনি আসন গ্রহণ করতে চান নি। বিপ্লবের জয়গান—পরাধীন দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা ও বাংলার মাটির গান গেয়ে বাঙালীর প্রাণে সাড়া জাগানো ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছিল কাজী সাহেবের একমাত্র ব্রত। আমরা দেখেছি বাংলার যুবসমাজকে একসময় তিনি কিভাবে নাড়া দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। জোরালো বক্তব্য জোরালো ভাষায় সর্বজনবোধ্য রীতিতে স্পষ্টভাবে অথচ নতুন ভঙ্গীতে প্রকাশ করার অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর।

মোসলেম ভারতে ও বিজলীতে যখন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হ'ল তখনই সারা দেশের দৃষ্টি পড়লো তাঁর ওপর। কে এই কবি? তারপর ধূমকেতু পত্রিকার মাধ্যমে অগ্নিবীণার সুর যখন ঝঙ্কারিত হয়ে উঠল—তখন কাজী নজরুলের কাব্যের সুর বাংলাদেশের জনমানসে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সে-কথা সে-যুগের লোকেদের অনুভূতিতে আজও জাগ্রত এবং সেই কারণে কাজীর প্রতি সকলে শ্রদ্ধান্বিত। এ কথাগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

কাজী নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনে আলাপ করার সুযোগ আমার হয় নি। পরবর্তীকালে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমরা একই সংস্থায় গ্রামোফোনে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ও বেতারে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছি এবং সাহিত্যিকদের বহু আড্ডায় ও আমাদের

আপিসের আড্ডায় দিনের পর দিন তাঁব দিল্‌খোলা মেজাজ, হো হো করে হাসি, গান, গল্প ও আবৃত্তি শুনে বহুদিন কাটাবার যে সুযোগ পেয়েছি তা কিছুতেই ভুলতে পারি নি—এখনও তাঁকে স্মরণ করলেই সেই আনন্দময় মূর্তিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জীবনে এই মানুষটি একেবারে নীরব হয়ে যাবেন তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল—কিন্তু জানি না বিধাতার কি অভিপ্রায়ে তিনি এক বিরাট ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে রইলেন।

কাজী নজরুলের গান শুনি প্রথম শ্রদ্ধানন্দ পার্কে—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এক বক্তৃতা সভায়। তখন মাইক্রোফোনের আমদানি ঘটে নি—কিন্তু দু-মিনিটের মধ্যে গান গেয়ে তিনি এক বিরাট জন-সভাকে শান্ত করে দিয়েছিলেন। তখন সকলের মুখে কাজী নজরুলের নাম ছড়িয়ে পড়ল—তারপর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দু-তিনটি সভায় তিনি যখন আবৃত্তি ও গান শোনালেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বেশ মনে আছে কিন্তু সে সুযোগ আসে নি।

তারপর একদিন দেখলাম গায়ে একটি চাদর ঝুলিয়ে বিবেকানন্দ ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে (তখন অবশ্য বিবেকানন্দ রোড হয় নি এখানে) সাহিত্যরসিক স্বর্গতঃ গজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে কবি মোহিতলাল মজুমদার মশায়ের সঙ্গে কাজী প্রবেশ করলেন। গজেনদার বাড়িতে সেকালে একটি বিরাট সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আড্ডা বসত। এখানে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, নলিনীকান্ত সরকার, মোহিতলাল মজুমদার, কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচি, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, জ্যোতিষাচার্য হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও বহু সাহিত্যিক এখানে নিয়মিত আড্ডা দিতে আসতেন। বাড়ির মালিক এবং অন্যান্য সকল সাহিত্যিকের সঙ্গেই ভবিষ্যতে অতি অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছিল কিন্তু সে-সময় সকলের সঙ্গে আলাপ হয় নি। এঁদের সম্বন্ধে সে-সময় যে খবর

পেতাম তা শুধু আমার বন্ধু কবি বাণীকুমার ও নরেনদার (কবি নরেন্দ্র দেবের) মারফৎ। তবে গজেনদার মেজোভাই রামবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল খুব—তাঁকে একদিন বলেছিলাম, হ্যাঁ মশাই, কাজী নজরুল আপনাদের বাড়িতে আসেন বুঝি ?

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসেন কবি মোহিত-লালের সঙ্গে। কেন, আলাপ করতে চান ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আলাপ করার ইচ্ছে আছে বটে—তবে আপনার বড়দার আড্ডায় গেলে আমাকে কি আর তিনি আমল দেবেন, সেইজন্যে যেতে ইচ্ছে করে না।

রামবাবু বললেন, না না, কাজী সাহেব একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত দিল্‌খোলা লোক—আসুন না একদিন, আলাপ করলে আনন্দ পাবেন। কিন্তু কেন জানি না আমার যাওয়াও হয় নি, আলাপও হয় নি,—তারপর প্রায় পাঁচ-ছ' বছর পরে হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল ঐ বিবেকানন্দ রোডেই, নলিনদার (নলিনী-কান্ত সরকার) বাড়িতে। সেই দিন থেকেই এক ঘণ্টার মধ্যে যে গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বন্ধু হিসেবে তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর নীরব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

নলিনদা থাকতেন দু'তলার ফ্ল্যাটে, কাজী থাকতেন তিনতলায়। দুইজনের পরিবারের মধ্যে এত সৌহার্দ্য ছিল যে মনে হ'ত সবাই একই পরিবারভুক্ত। সেইখানে আমারও একটু স্থান হয়ে গেল। কাজী, দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত), নলিনীদা, তাঁর স্ত্রী, আমাদের শান্তি বৌদি সকলে মিলে মাঝে মাঝে জোর আড্ডা বসতো। গল্প, রসিকতা, গান, আবৃত্তি প্রায়ই চলত। দাদাঠাকুর আর কাজীর কথার লড়াই জমে উঠত খুব, আর দুজনের রসিকতায় হাসির ঢেউ উঠত বার বার—আর নলিনদাও কম রসিক ছিলেন না—এই তিন-জনের সমন্বয়ে যে অট্টহাস্যের সৃষ্টি হ'ত তাতে পাড়া-প্রতিবাসীরাও বুঝতে পারত যে আড্ডা কাকে বলে।

এর মধ্যে হঠাৎ শচীনদা (নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত) একদিন বললেন যে মনোমোহন থিয়েটারে তাঁর রক্তকমল বই অভিনীত হচ্ছে,

তাতে কাজী কতকগুলি অপূর্ব গান লিখে দিয়েছে ও নিজেই সুর দিয়েছে, সেটা যেন শুনে আসি। প্রবোধ গুহ মহাশয় তখন আর্ট থিয়েটার (স্টার) ও মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ দুটোই দেখাশোনা করছেন। তিনিই কাজীকে তিন-চারদিন থিয়েটারে রেখে গানগুলি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। রক্তকমল নাটকটি দেখতে গিয়ে যেমন নতুনত্বের আস্বাদ পেলুম তেমনি নতুনত্ব পেলুম রক্তকমলের গানের কথায় ও সুরে। শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতী আঙ্গুরবালার কণ্ঠে যে-গান সেদিন শুনেছিলুম তা আজও ভুলতে পারি নি। গানগুলি ছিল রক্তকমলের সম্পদ। অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না কেউ ভোলে বা মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নমো নমো নমো প্রভৃতি গানের কথা ও সুরের অভিনবত্ব থিয়েটারি গতানুগতিক সুর থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ছ-সাতটি গান রচনা ক'রে, সুর দিয়ে স্বয়ং কাজী সকলকে চমকিত করে দিয়েছিলেন।

কাজীর এই শক্তির পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি। নাট্যভারতী থিয়েটারে (পুরাতন এ্যালফ্রেড থিয়েটার) তখন নতুন বই খোলা হবে—কিন্তু সে-সময় আমাদের হাতে কোন বই ছিল না।

রঙমহল থিয়েটারের বাড়িওয়ালার সঙ্গে কতকগুলি বিষয় নিয়ে আমাদের থিয়েটারের মালিক রঘুনাথ মল্লিক মহাশয়ের বনিবনা হচ্ছিল না। রঘুনাথবাবুর শ্বশুর, আর্ট থিয়েটার্সের অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে পরিচিত গদাধর মল্লিক মহাশয় তখন থিয়েটার দেখাশোনা করতেন। তটিনীর বিচার নাটকটি তখন রঙমহলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। আমি, শচীনদা তখন রঙমহল থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—কিন্তু বাড়ির মালিক ও থিয়েটার মালিকের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় কিছু করা গেল না। গদাধরবাবু অবশেষে থিয়েটার তুলে দেবার সঙ্কল্প করলেন কিন্তু আমার ও শচীনদার আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন। কিছুদিন আমরা হাতীবাগান বাজারের ওপর একটা বড় হল্ নিয়ে ও থিয়েটারের দল নিয়ে শহরের বাইরে অভিনয়ের আয়োজন করতে লাগলাম, তারপরে, গদাইবাবু

বুঝলেন এভাবে দলকে জীইয়ে রাখা যাবে না—একটা বড় থিয়েটার হল দরকার। পাওয়া গেল হ্যারিসন রোডে এ্যালফ্রেড্ থিয়েটার। সেইটি লীজ নিয়ে থিয়েটার চালু হল। শচীনদা নামকরণ করলেন—নাট্যভারতী।

আমাদের হাতে নাট্যভারতী পরিচালনার ভার যখন এল তখন আবার দলের প্রধান অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী মশাই মাস চার-পাঁচের জন্য বোম্বাইয়ে ছবি করতে চ'লে গেলেন। অহীনবাবু স্টার-অভিনেতা, তাঁকে বাদ দিয়ে কোন নাটক জমানো মুশকিল—অথচ একটা নতুন নাটক না খুললেই নয় কিন্তু আমাদের দলে তখন জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, সাবিত্রী দেবী (বড়) প্রমুখ অভিনেতৃবর্গ ছিলেন তবুও স্টার-অভিনেতা না থাকায় নতুন নাটক খুলতে ভরসা হচ্ছিল না। আজকের দিনের সঙ্গে তখনকার দিনের অনেক তফাৎ ছিল। নামজাদা স্টার ছাড়া অভিনয় চলত না।

এই সময় হঠাৎ কাজীর সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানিতে ব'সে থিয়েটারের কথা আলোচনা করতে করতে আমাদের নাটক প্রযোজনার অসুবিধের কথা উঠল। কাজী আমায় বললেন, দেখ, আমি একটা গীতি-নাট্য সম্প্রতি লিখেছি তার নাম মধুমালা, তোমরা যদি কর তো দিতে পারি—ওতে কোন স্টার-অভিনেতার তো দরকার হবে না, তবে দু'চারজন বড় গায়িকাকে নিতে হবে।

আমি বললুম, বইটা আমায় পড়তে দিতে পার?

কাজী বললেন, নিশ্চয়, কালকেই তোমার কাছে সকালে পাঠিয়ে দেব।

পরের দিন মধুমালা পেলাম। অপূর্ব লেখা—যেমনি তার ভাষা তেমনি গানের কথা। ভারী লোভ হ'ল নাটকটি প্রযোজনা করার। গদাধর মল্লিক মশায়ের কাছে সোজাসুজি থিয়েটারে গিয়ে প্রস্তাব করলুম—কাজী নজরুল ইস্‌লামের গীতি-নাট্যটি আপনি করুন।

গদাধর মল্লিক মশাই ও তাঁর পুত্র বিদ্যাধর মল্লিক উভয়ে বললেন, বইটি শোনান না আমাদের। শোনানো হল থিয়েটারের

অনেকের কাছে। সবারই খুব ভাল লাগল। কিন্তু অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী বললেন, এ বই করতে কিন্তু যথেষ্ট খরচ পড়বে আর দৃশ্যপট ভাল করতে হবে, দুজন ভাল গায়িকা নিতে হবে এবং প্রযোজনার খরচ উঠবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আমি খুব দমে গেলুম।

গদাধরবাবু একটু ভেবে বললেন, খরচ উঠুক না উঠুক, কাজী সাহেবের বই আমি পরীক্ষামূলক ভাবেই করব—বাংলা থিয়েটারে অনেককাল গীতি-নাট্য হয় নি—বীরেনবাবু, আপনি কাজী সাহেবকে নিয়ে আসুন।

মহোৎসাহে কাজী সাহেবকে সন্ধ্যেবেলাতেই নিয়ে এলুম নাট্য-ভারতীতে। মঞ্চযাদুকর নানুবাবু (মণীন্দ্রনাথ দাস) দৃশ্যপট কিভাবে হবে তার পরিকল্পনা করতে বসলেন, আমাদের অভিনেতৃগোষ্ঠীতে নাচগানের সব মেয়েদের মহলার বন্দোবস্ত হয়ে গেল আর শ্রীমতী রাধারাণী ও হরিমতিকে নেওয়া হল অতিরিক্ত গায়িকা হিসেবে। সাতদিনের মধ্যে অভিনয়, প্রযোজনা কিন্তু ক'রে দিতে হবে এই ছিল শর্ত। কাজী ও আমি রাজী হয়ে গেলুম—তখন দেখলাম কি নিষ্ঠার সঙ্গে সখির দল থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেক গায়িকাকে ধ'রে ধ'রে কাজী সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত গানের সুর আয়ত্ত করাচ্ছেন। দুপুরবেলা দশ মিনিট একটু যা হ'ক খাওয়া, আর সারাদিন শুধু পান ও চায়ের ওপর নির্ভর ক'রে সাতটা দিন যে অমানুষিক পরিশ্রম তিনি করেছিলেন তার তুলনা ছিল না।

বাংলাদেশে নতুন ধারায় এই গীতি-নাট্যটি অভিনীত হ'ল—গুণীজনরা প্রশংসায় আমাদের প্রোৎসাহিত ক'রে তুললেন, কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশ রাত্রির পর বিক্রি কমতে লাগল। পরিচালক ও গ্রন্থকার উভয়েই খুব মুষড়ে পড়লুম কিন্তু এখানে একটা কথা না বললে অন্যায় হবে, গদাধর মল্লিক মশাই আমাদের বললেন, দুঃখু করবেন না মশাই, বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে নতুনত্ব আপনারা করেছেন, বিশেষ কাজী সাহেব এই বাইশখানা গানে যে সুর-সংযোজনা ক'রে, প্রত্যেক দৃশ্যে নূতন ভাবধারা এনে দিয়ে, ভাল ভাল বোদ্ধা

লোকদের খুশি করে দিয়েছেন তাইতেই আমি মহাতৃপ্তি পেয়েছি। দুঃখের কথা বাংলাদেশের দর্শক এখনও এইসব গীতি-নাট্য দেখার মেজাজ পায় নি—ইউরোপে এ রকম বই হ'লে লোকে তাঁকে মাথায় করে রাখত।

খুব দুঃখের বিষয় মধুমালা বইটির পর কাজী আর কোন নতুন গীতিনাট্য লেখার পরিকল্পনা করেন নি। অথচ বাংলা রঙ্গালয়ে তখনকার বহু নাটকে কাজীর সঙ্গীত ও গীতিমাল্য আমাদের নাটক-গুলিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে কম সাহায্য করে নি। মন্মথ রায়ের 'কারাগার', শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটকে গান লিখে, সুর দিয়ে এবং শিখিয়ে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের যে-সেবা করে গেছেন তার বিনিময়ে তিনি কখনও কিছু দাবি করেন নি—অথচ আমি দেখেছি দিনের পর দিন কী পরিশ্রম তিনি করেছেন তার জন্যে। বাংলা রঙ্গালয়কে ভালবাসতেন খুবই এবং রঙ্গালয়ের যখনই কোন বিষয়ে অসুবিধা হয়েছে তখনই তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে ছুটে গেছেন তার অসুবিধা দূর করতে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় হঠাৎ মিনার্ভা থিয়েটারে আমার রচিত একটি প্রহসন 'ব্ল্যাক-আউট' অভিনয় করার জন্য নাট্য ও ছায়াচিত্র প্রযোজক কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ও রণজিৎ রায় ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। যুদ্ধের সময় লোক আসবে না ভেবেই হয়তো সেটি কিছু-দিনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই প্রহসনটি একশো রাত্রির উপর পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে গেল—এই প্রহসনের জন্য কাজী আমার অনুরোধে তিন ঘণ্টার মধ্যে দুটি হাসির গান যা নিজে রচনা ক'রে ও সুরযোজনা ক'রে দিয়েছিলেন, তা না থাকলে এই প্রহসনটি অত জমতো কিনা সন্দেহ।

এইসব খুঁটিনাটি ছোটখাটো জীবনের ঘটনাগুলি বলার উদ্দেশ্য যে কী ধরনের মানুষ এই কবি সেইটি পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া। এমন নিরহঙ্কার, বন্ধুবৎসল, সদাহাস্যময় কবির সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের কয়েকজনের হয়েছিল, এইটে যখন আজ ভাবি, তখন আনন্দে বুক ভরে ওঠে। নজরুলের নাম তখন লোকের মুখে মুখে,

চতুর্দিক থেকে জয়ধ্বনি কিন্তু তাঁর কোন বন্ধুকে কখনও তিনি বুঝতেই দিতেন না যে তিনি একজন বাংলার বরণীয় কবি এবং আমরা নগণ্য।

বেতারের সঙ্গীত প্রযোজক হিসাবে যখন তিনি কাজ করতেন তখন তাঁর পাশাপাশি নাট্যবিভাগে একত্রে কাজ করেছি, গ্রামোফোনে, রঙ্গমঞ্চে সর্বত্র পাশাপাশি ব'সে দিনের পর দিন কেটে গেছে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টার ভেতর দিয়ে। এই সদানন্দময় কবির সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই এ কথা স্বীকার করবেন মানুষ হিসেবে এমন দিলখোলা লোক খুব কমই দেখেছেন।

কবিত্ব ও সুর ছিল তাঁর সহজাত। আর একটা ছিল জিদ্‌ —যেটা ধরবেন সেটার শেষ দেখে ছাড়বেন। প্রেমিক হিসেবেও তাঁর দুর্দান্ত আবেগের পরিচয় যেমন আমরা পেয়েছি, আবার সাধক হিসেবেও শেষের দিকে একটা শান্ত সমাহিত ভাব লক্ষ্য করেছি।

ইসলামীয় শাস্ত্র ও হিন্দু শাস্ত্র তিনি যে কত পড়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। একদিন মনে আছে বেতার অফিসে আমরা দুজনে বসে আছি—বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কেউ বেরুতে পারছি না, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'ল। ঠিক দুটি ঘণ্টা নজরুল আমাদের শাস্ত্র ও অধ্যাত্মমার্গের এত কথা বলতে শুরু করলেন যে বিস্ময়ের অবধি রইল না। বোধ হয় এই কারণে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব কখনও প্রশ্রয় পায় নি। অথচ এ কথা বললেও ভুল হবে যে তিনি পুরো হিন্দু ভাবকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন —মোটেই নয়। সত্য আবিষ্কার ও সেই সত্যকে জীবনে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর ব্রত—সে সত্য ইস্‌লামের হ'ক, খ্রীশ্চানের হ'ক, কিংবা হিন্দুর হ'ক তা গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা বোধ করতেন না।

সব জিনিস বুঝবো এই ছিল মনোভাব। শেষের দিকে যখন তাঁর মানসিক বিস্মৃতি আসে নি তখন দেখতাম বেতার অফিসে গেরুয়া আলখাল্লা, চাদর নিয়ে ঢুকছেন, শিল্পীদের গান শেখাচ্ছেন। আমি একদিন বললুম, হঠাৎ তোমার এ রকম পরিবর্তন ঘটল কেন বল তো?

নজরুল বললেন, আমি যোগাভ্যাস করছি। যোগের মধ্যে দিয়ে সত্যি কোন জিনিস পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য।

অবশ্য তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হবার আগেই এক রহস্যময় নীরবতা তাঁকে আক্রমণ করলে—তিনি থেকেও যেন হারিয়ে গেলেন।

আর একদিনের একটি ঘটনা মনে আছে। কাজের শেষে ট্রামে ক'রে উত্তর কলকাতায় আমরা দুজনে বাড়ি ফিরছি। ট্রামটি ফাঁকা—লোকজন খুব অল্প। আমি হঠাৎ বললুম, দেখ ভাই কাজী, তুমি এই সংসার চালাবার জন্যে গ্রামোফোনে রেডিওয় গান লিখে, সুর দিয়ে নিজেকে এভাবে নষ্ট করছ কেন? সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তুমি যেন সরে আসছ মনে হচ্ছে। অথচ তোমাদের মত জাত-সাহিত্যিকদের লেখার জন্যই আমরা গর্ব অনুভব করি।

কাজী বললেন, বীরেন, বাংলা সাহিত্যের জন্যে যারা প্রাণপাত করবে তারা তো খেতে পাবে না বুঝে আমি সত্যিই একটু দূরে সরে আসছি। আমার সংসারে সাত-আটশো টাকা নিয়মিত প্রয়োজন, আমার কবিতার বই থেকে সে টাকা আসবে কি? লোকে মালা দেবে গলায় কিন্তু সে মালা তো শুকিয়ে যাবে এক রাতেই—তখন কি সমস্ত জয়মাল্যের কাছি নিয়ে ঝুলে পড়বো বলতে চাও?—বেশ আছি ভাই, গান-বাজনা নিয়ে মেতে আছি ভালোই আছি।

তাছাড়া আর একটা কথা কি জান, ভাল ভাল কবিতা লেখার ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে—আজকেই একটা প্রেমের কবিতা লিখেছিলুম, হঠাৎ তারপর কি মনে হ'ল, ভাবলুম একবার রবীন্দ্রনাথের দু'চারটে এই ধরনের কবিতা উল্টে দেখি তো—দেখলুম, না, সেগুলোর কতক ভাবধারা আমার রচনার ভেতর অজান্তে চলে এসেছে। আমি ফেলে দিলুম। এখন বুঝছি ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি যতদিন মাথার ওপর থাকবেন, ততদিন আমরা ওঁকে ডিঙোতে পারব না—অতএব আপাততঃ চুপচাপ থাকবার মতলব করে রেখেছি। পরে, বুঝলে? আদাজল খেয়ে লাগব!

নজরুলের কথা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে নজরুল নিজেও হাসির বন্যা ছুটিয়ে দিলেন। দু'চার-জন ট্রামযাত্রী যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদের হাসির কারণটা না বুঝতে পেরে তীব্র দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

এরও কিছুদিন পরে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বাহ্ণে হঠাৎ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব তাঁকে একদিন ডেকে পাঠালেন। নজরুল ফিরে এলেন ঘণ্টা তিনেক পরে—রেডিও আপিসেই। সেদিন তাঁর রিহার্সেল ছিল, তাই কয়েকজন আর্টিস্ট বসে ছিল দীর্ঘক্ষণ—ফিরে এসেই তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, আজ আর রিহার্সেল নেব না, তোমরা কাল এস। তারা চলে গেল। দেখলাম নজরুল খুব চিন্তিত।

আমরা তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, কি হ'ল বল তো? হক সাহেব তোমায় হঠাৎ তলব করলেন, কী ব্যাপার?

নজরুল বললেন, হক সাহেব যা বললেন তা বিশেষ উদ্বেগজনক। মুসলিম লীগ বাংলাকে ভাগ করে নিতে চায়—ফজলুল হক সাহেব সেই সম্পর্কে আমার মত জিজ্ঞাসা করাতে আমি বললুম, বাংলা দেশকে ভাগ করা মানে বাঙালী জাতকে ধ্বংস করে দেওয়া। আমি জানি না আপনার কি মত, আমি সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবো। বাঙালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি শুধু হিন্দুরাও গড়ে নি, মুসলমানরাও গড়ে নি—এই দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বাঙালী জাতকে তৈরি করেছে—একে ভাগ করবেন কি ক'রে? একটা সাময়িক ধর্মীয় ব্যাপার টেনে এনে যদি তা করা হয়, তাহলে আমাদের সকলের যে কী সর্বনাশ হবে তা পরে বুঝবেন। হক সাহেব বলে উঠলেন, আমারও তাই মত —আমি রোখবার চেষ্টা করব।

কিন্তু রুখতে কেউ পারেন নি। ভাগ হয়ে গেল দেশ অদ্ভুত ঘটনার বিবর্তনে। তারপর থেকে নজরুলও নীরব হয়ে রয়ে গেলেন—আজও রয়েছেন। প্রথম প্রথম আমাদের দেখে তবু যেন চিনতে পারতেন কিন্তু আজ তিনি তাঁর কোন বন্ধুকেই চিনতে পারেন না। শুধু তাঁর কোন গান হলে উল্লসিত হয়ে ওঠেন—তা মুখ দেখলে বুঝতে পারা যায়। তা ছাড়া সর্বদাই ভাষাহীন অবোধ শিশুর মত তিনি সবার দিকে চেয়ে থাকেন। এটা শুধু কবির পক্ষে নয়, আমাদের ও দেশের পক্ষেও অতি করুণ ট্রাজেডি।

—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

কি বলবো? ওঁর সাহিত্য? সাহিত্য ছিল, এই মুহূর্তে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। বিচাবের ভার রইল ভাবীকালের ওপর। সুতরাং ও-নিয়ে এখন নয়, আরেক দিন কথা হবে। আজ মন ভাল নেই। বন্ধু নজরুল সম্পর্কে প্রশ্ন করায় সমসাময়িক কালের এক সুহৃদ মনোজ বসু এইভাবে শুরু করলেন। বললেন, থাক না, কি হবে দুঃখের কথা লিখে? হয়ত এইভাবে দুঃখ পেতেই রয়েছি আমরা। এত সবই তো দেখতে হল। শুনতেও হল কিছু কিছু। আপনি শুনেছেন কি যে নজরুল বলেছিলেন, তাঁর সমাধি যেন রচিত হয় কোন মসজিদের পাশে? কথাটা আমার দিকে শ্লেষের ভঙ্গীতে ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে মাথা ঝুঁকে বসলেন উনি।

আমি নির্বাক। মনোজ বসু যেন নিজেকে শোনানোর জন্যই বিড়বিড় করে বলে চললেন—সাহিত্য, হায় তুমিও শেষে রাজধানীব খেলায় তুরুপেব তাস হলে! কি করে পারলেন ঢাকা রেডিও কবির মৃত্যুর পর কেবল ইসলামের ইসলামী গান বাজাতে, নজরুল-গীতির অগাধ ভাণ্ডারে অমন সব গজল গানের মণি-মুক্তোর খবর কি তাঁরা রাখেন না? কি করে বলতে পারলেন যে, কবি চেয়েছিলেন তাঁর সমাধি-শয্যা যেন মসজিদের পাশে রচিত হয়! অমন একটা মানুষকে এঁরা এত ছোট ক্যামেরায় দেখলেন। ওপারের সাহিত্য-প্রেমীরাও কি রাজনীতিব ছল-চাতুবীতে ভুললেন অবশেষে?

মুকুন্দ দাসের গানের কথা জানেন তো! ঠিক তেমনি ছিল নজরুলের ব্যাপাব-স্যাপার। শহরে বন্দরে, কি আড্ডায়, সভায় উঁ গাইতে বসলে রক্ত যেন ফুটিয়ে তুলতেন পরাধীন মানুষগুলোর। কি উদ্দামতা সেই বিপ্লবী গানের! আর গলা? যেন আবেগ জাগাতে হুকুম করার হাবিলদার। উঁ গাইছেন সেই বিখ্যাত লাইন "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা...." বুঝেছেন, সে ঠিক বলা যায় না। যে না

শুনেছে সে জানে না। উদাত্ত গলায় ওঁ গাইছেন "....আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান?" পাশে বসে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে, চোখের সামনে যেন এক এক করে সত্যিই বিপ্লবীরা এসে দাঁড়াচ্ছেন। ওঁর গলার গান মানেই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। গলায় জোর কি! গাইছেন তো গাইছেনই। একটার পর একটা। জনতার অনুরোধের ক্ষান্তি নেই আর ওঁর নেই ক্লান্তি। গেয়েই যাচ্ছেন। "দে গরুর গা ধুইয়ে!" মাঝে মাঝে মুহূর্তকালের বিরতি। ডিবে থেকে একটা পান মুখে দেওয়া। ব্যস, আবার সেই জীবন-শক্তিতে ভরপুর নজরুল।

ওই জীবনীশক্তির কথায় মনোজবাবু বললেন, প্রতুল গুপ্তর প্রচেষ্টায় আর কাজী আবদুল ওদুদের অভিভাবকত্বে ওঁকে যখন মানসিক চিকিৎসার জন্য ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ভিয়েনার ডাক্তাররা ওঁকে পরীক্ষা করে কি বলেছিলেন জানেন? ওঁরা বলেছিলেন, রোগীর মস্তিষ্কের এই অবস্থায় ইনি যে কি করে এতদিন বেঁচে আছেন সেইটেই আমাদের বিস্ময়!

নিজের মনেই একনাগাড়ে বলতে বলতে মনোজবাবু মুখ তুললেন, জানেন, দুঃখটা এখানেই। আমরা যারা পাশাপাশি মিশেছি ওঁর সঙ্গে তারা তো জানি। আসলে মানবধর্মের কাছে আর কোন ধর্মই যে দাঁড়াতে পারে না, এইটেই ছিল ওঁর সাহিত্যের, ওঁর গানের মূলমন্ত্র। আমরাও সময়ে সময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতাম ওঁর মধ্যে মানব ধর্মের প্রকাশ দেখে। সবার ওপরে মানুষ সত্য—সাহিত্যে এই ছিল ওঁর ইষ্টমন্ত্র। গান বলুন, সেখানেও ওই বীজমন্ত্রই শুনিয়েছেন উনি। হিন্দু না ওঁরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? যে ডুবিছে সে তো "মানুষ", সে যে সন্তান মোর মার!

এখানে যে "সমবেদনায় সকলি হয়েছি ভাই।"

শুধুমাত্র ধর্মকেন্দ্রিক আওয়াজ বা জিগীর যে কত তুচ্ছ তা নজরুলের কাছে গেলে টের পাওয়া যেত। মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধে ভাল জানতেন। সমান জানতেন হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধেও। বেদ, পুরাণ ও উপনিষদ নিয়ে গবেষণার মত যত্ন করে পড়েছেন। লেখাতেই প্রমাণ রয়েছে তার।

অচিন্ত্য বই লিখবে, তা কাশীতে চিঠি পাঠালে যোগী কালীপদ গুহরায়ের কাছে। স্বদেশী আন্দোলনে উনি নজরুলের পাশে ছিলেন এক সময়। দুজনেই যোগী বরদাকান্ত মজুমদারের অনুগামী হয়েছিলেন পরে। কালীপদ অচিন্ত্যকে জানিয়েছিলেন, "কাজীর এখন মৌনদশা। যোগীরা এক সময় এ-রকম মূক হয়ে যান। উপাখ্যানের জড়ভরতের মত।"

পরিবর্তন ওঁর মধ্যে এসেছিল ৪২-এর অনেক আগে থেকেই। সালটা মনে নেই ঠিক, এক সময় চাইলুম 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার জন্য একটা লেখা। বললেন, লেখাটেখা এখন আর ভালো লাগে না। অমৃত আনন্দের সন্ধানে রয়েছি এখন। যোগ-সাধনা তখন চলছে পুরোদমে।

একটু যেন স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিতে চাইলেন মনোজবাবু। বললেন, জানেন একটি ছেলের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আসত ও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রটি তখন নাম লিখিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। মুক্তিফৌজ হিসেবেই আসতো আশ্রয়ের জন্য। আমার কাছে ওর একটাই সাধ জানিয়েছিল ও। নজরুলকে একবার চোখের দেখা দেখার সুযোগ করে দিন। বলেছিলুম, দেব। নিয়ে যাব তোমায়। ওই নিয়ে যাওয়ার আর্জি বারংবার শুনে একদিন বলেছিলাম, কিসের জন্য এত আগ্রহ তোমার? এখনকার কবিকে দেখে তো শুধু কষ্টই পাবে। আমার কথা শুনে অদ্ভুতভাবে হেসেছিল সেই যুবক। কেন, কষ্ট হবে কেন? আমার কাছে কবি তো সদাবাঙ্ময়। জানেন, ক্যাম্পে আমরা অনেক রাত অবধি কাজীর কবিতা আবৃত্তি করি।

দুঃখ হয়, এই সৈনিকটির শেষ সাধটি পূর্ণ হয় নি। কোনবারই তো এসে ঠিকমত থাকতো না। প্রায়ই আসত শুধু দুপুরটার জন্য। যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা গিয়ে প্রথমেই ওর খবর নিয়েছিলাম। ও বেঁচে ছিল না তখন। শোনা মাত্র কি যে হল আমার! সামলাতে পারলাম না কান্না। বারংবার মনে হচ্ছিল ওর কথা। হয়ত শেষ দিনটিতেও ও আবৃত্তি করেছিল নজরুলের কবিতা।

মুজিব ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। জানতেন এবং মানতেন মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষদের দেশাত্মবোধ জাগাতে বিদ্রোহী কবির গানের অনুপ্রেরণার কথা। তাই উনি চেয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কবির আশীর্বাদ নিতে। আমার কাছে পরিষ্কার বলেছিলেন, আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে বলতাম, সোনার বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করুন আমাদের।

এখানে না পাঠান, ওখানেই কি আর কিছুক্ষণ রাখা যেত না তাঁর মরদেহটি! আমরা সাহিত্যানুরাগীরা দূরেই না হয় রইলাম, কবিপুত্রের জন্য কি অপেক্ষা করা যেত না খানিকটা সময়? ওদের তো যেতে দেরি হয় নি তেমন। আর দেরিই বা কি, নানা ব্যবস্থাদির ফলে এখন তো ওটা কোন সমস্যাই নয়। রাশিয়াতে দেখেছি লেনিন এবং স্ট্যালিনের মরদেহ অবিকল রাখা আছে যত্নে। মৃত্যুর পরে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহও ঠিক তেমনটি রাখা হয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ।

ভাবুন তো প্রমীলা দেবীর কথা। গোঁড়া হিন্দুঘরের মহিলা হয়েও স্বেচ্ছায় ভালবেসেছিলেন কাজীকে, আমৃত্যু সেবা করেছিলেন তাঁর। ওই রকম মানুষকে ভালবাসা! যাঁরা নজরুলকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন কাজটা উদ্দাম সৈনিককে শান্ত সমীরে স্নিগ্ধ করারই মত। তাঁর অন্তিম ইচ্ছাটিকে অবজ্ঞা করা—এ কি প্রগল্‌ভতা না স্পর্ধা?

—মনোজ বসু

আমার বাল্যবন্ধু নজরুল প্রসঙ্গে

আজকাল অনেকেই আমাকে অনুরোধ করছেন—নজরুল ইসলামের গল্প বলুন। আপনাদের ছেলেবেলার গল্প।

কেন করছেন জানি। নজরুল বেঁচে রয়েছেন, কিন্তু সে আর কোনোদিন কথা বলবে না। কাজেই তার কাছ থেকে কিছু শোনবার প্রত্যাশা নেই। এখন একমাত্র ভরসা আমি।

আমিও তো আজ আছি কাল নেই।

আমি চলে গেলে সে-সব কথা বলবার কেউ থাকবে না। অনেক কিছু না বলা থেকে যাবে। তাই লিখছি।

কিন্তু এ-অনুরোধ আমাকে অনেকদিন ধরে অনেকে করছেন, আমিও আমার স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে টুকরো টুকরো অনেক লেখা লিখেছি। অনেক পত্র-পত্রিকায় সে-সব লেখা ছড়িয়ে আছে।

তবে আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি অনেক সময় আমাদের বড়ই বিভ্রান্ত করে। কোথায় কোন্ সময় কি লেখা লিখেছি মনে থাকে না।

নজরুল আর আমি অনেকদিন ছিলাম রাণীগঞ্জে। তখন আমরা ইস্কুলের ছাত্র। সেখানে অনেক পরিচিতের মধ্যে আজ একটা মজার চরিত্রের কথা বলি।

রোগা ডিগ্‌ডিগে হাড্ডিসার লম্বা একটা ছেলে—নাম দুর্গা। তাকে নানাজনে নানারকমের নাম ধরে ডাকে। কেউ বলে দুগিয়া, কেউ বলে দুখীয়া, আবার কেউ কেউ বলে মতিয়া। দুর্গা বলে কিন্তু কেউ তাকে ডাকে না।

ভারি মজার ছেলে এই দুগ্‌গা।

একদিন বংশীদের বাড়িতে বসে আছি আমরা। আমি বংশী আর নজরুল। আমাদের ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেনের বাড়ি কাছেই। বংশীর চাকরকে পাঠিয়েছি শৈলেনকে ডাকতে। শৈলেন এলেই আমরা উঠবো। স্টেশনের দিকে বেড়াতে বেরুবো আমরা চারজনে।

এমন সময় দুগ্‌গা এসে ঘরে ঢুকলো।

এসেই আমাদের ভেতব সামনে যাকে পেলে তার পা টিপতে আরম্ভ করলে।

দুগ্‌গা যখনই এসেছে তখনই জানি দুটি পয়সা তার চাই-ই। না নিয়ে কিছুতেই উঠবে না।

আমি পকেট হাতড়াচ্ছি দেখে বংশী বলে উঠলো, কি খুঁজছো? পয়সা? দেবে বুঝি দুগিয়াকে?

বললাম, হ্যাঁ।

বংশী বললে, না দেবে না। হারামজাদা চোর। সেদিন আমার একটা কলম নিয়ে পালিয়েছে।

ফাউন্টেন পেনের এত ছড়াছড়ি তখন ছিল না। এমনি নিব-দেওয়া কলমেই আমরা লিখতাম। বললাম, কলম নিয়ে ও কি করবে?

বংশী বললে, বেচবে। এক পয়সা দু পয়সা—যার কাছে যা পাবে তাইতেই বেচে দেবে।

ছুগিয়া বললে, মাইরি বলছি আমি তোমার কমল নিইনি।

—নিশ্চয়ই নিয়েছিস। চোর কাঁহাকা! ভাগ্।

বলেই বংশী তার মাথায় এক চাঁটি মেরে বললে, দ্বারকাদেব হেঁসেলে ঢুকে তুই সেদিন ভাত চুরি করে খেয়েছিস। বল্ খাস্‌নি? বলেই আবার আর এক চড়!

চড় খেয়ে ছুগিয়া হাসতে হাসতে বললে, বলছি তো খেয়েছি। খিদে পেয়েছিল খেয়েছি।

—চেয়ে খেলেই তো পারতিস?

ছুগিয়া বললে, চাইলে দেয় না। তেড়ে মারতে আসে। বলে, ব্যাটা চোর।

চোরই তো!

শহরের যেখানে যা-কিছু চুরি হোক্, ছুগিয়াকে একবার ধরবেই।

ধরবে আর বেধড়ক মারবে।

এই নিয়ম।

তা ব্যাটা এত যে মার খায় ছুগিয়ার চোখে জল কেউ কোনোদিন দেখেনি। পাতলা হাড্ডিসার দেহ। মনে হয় যেন ইস্পাতের তৈরি। কতদিন দেখেছি পুলিসে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হাতের ছোট রুলটা দিয়ে পেটে পিঠে গুঁতো মারছে, আর ছুগিয়া পান চিবোতে চিবোতে খিল্‌খিল্ করে হাসছে।

—আহা, চল না—যাচ্ছি তো। সুড়সুড়ি দিচ্ছ কেন?

কোথায় তার বাড়ি, কে তার মা, কে তার বাবা—কিছুই সে বলে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, জানি না।

জানে না নিশ্চয়ই। জানলে আমরা জানতে পারতাম।

সেই যে একটা কথা আছে—'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে' —ছুগিয়ারও ঠিক তাই। প্রায়ই দেখি সে রাত কাটায় রেল-স্টেশনের

ওয়েটিং রুমে। সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, নয়তো ওভারব্রিজের তলায়। শীতকালে দেখি—জন মণ্ডলের ঘড়ির দোকানের ঢাকা-বারান্দায়।

এই জন মণ্ডলের সঙ্গে ছুগিয়ার ভাব যেন গলায় গলায়।

জন মণ্ডল জাতে ক্রিশ্চান। ছেঁড়া আধময়লা কোট প্যান্টুলান পরে, গলায় একটা টাইও বাঁধে, মাঝে মাঝে শোলার একটা হ্যাট্ মাথায় দেয়। গায়ের রঙ হুঁকোর মত কালো।

ঘড়ির একটা দোকান আছে জন মণ্ডলের। দিনের বেলা চোখে একটা আইগ্লাস লাগিয়ে মাথা হেঁট করে আপন মনে ঘড়ি মেরামত করে। মনে হয় যেন নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা মানুষ। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা দেখি তার অন্য রূপ। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ছুগিয়ার সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে টলতে টলতে রাস্তা পার হয়ে যায়। চীৎকার করে গান ধরে ছুজনে। সে গানের সুরও যেমন—ভাষাও তেমনি। বেশির ভাগ ইংরেজি গান।

জন মণ্ডল ক্রিশ্চান তো! বাংলা গান গাইবে কেন?

রাস্তা দিয়ে যদি গাড়ি পার হয় তো জন মণ্ডল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে সাবধান করতে থাকে। বলে—সামাল্‌কে বাবা সামাল্‌কে। ভাল করে চোখ চেয়ে চল। মাতালের মত টলতে টলতে যেয়ো না। দেখেছিস্ ছুখীরাম, ব্যাটা গাড়ি নিয়ে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়তে চায় কে!

এই বলে ছুজনে একেবারে রাস্তার একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ছুগিয়া বলে, ব্যাটাকে মারবো?

জন মণ্ডল বলে, মার্!

মার্ বলে নিজেও হাত তোলে। তারপর বেসামাল হয়ে গিয়ে এক-একদিন পা হড়্‌কে পড়ে যায় নর্দমার ভেতর।

জন মণ্ডলই পড়ে। ছুগিয়াকে কোনোদিন নর্দমায় পড়তে দেখিনি। ছুগিয়া হ্যা হ্যা করে হাসে, আর জন মণ্ডল হাউ মাউ করে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, হাসছিস যে ব্যাটা, ধর্—আমাকে টেনে তোল্ এখান থেকে। না তুললে কাল আমাদের মিউনিসি-

প্যালিটির চেয়ারম্যানের শ্রাদ্ধ করবো কেমন করে? কাল যেতে হবে মিস্টার সেনের কাছে।

তারপর নর্দমা থেকে উঠে কান্না থামিয়ে জন মণ্ডল ধরে বসে, বল্ যাবি?

ছুগিয়া বলে, আমি কেন যাব?

—যাবি না? তুই তো সাক্ষী?

—কিসের সাক্ষী?

জন মণ্ডল বলে, এই যে নর্দমাগুলো—বল্ দেখি কোথায় থাকে? রাস্তার ধারে তো?

ছুগিয়া, বলে, হ্যাঁ, রাস্তার ধারেই তো নর্দমা থাকে।

জন মণ্ডল বলে, হ্যাঁ, থাকে দিনের বেলা, কিন্তু রাত্তির হলে ওরা রাস্তার মাঝখানে আসে কেন? মাঝখানে না এলে আমি পড়লাম কেন? নিজের চোখে দেখলি তো? আমাকে টেনে তুললি তো! এই কথা বলতে হবে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিস্টার সেনকে। না বললে এর প্রতিকার হবে না। নে চল্ এবারে। গান ধর্।

আবার গান ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে তারা চলে যায়।

এই হলো ছুগিয়া, আর এই হলো জন মণ্ডল।

নজরুল আর আমি একদিন ভারি বিপদে পড়লাম।

ট্রেনের তলায় পড়ে একদিন একটা সাঁওতাল মেয়ে কাটা পড়েছিল। আমরা দেখতে গেলাম।

দেখতে গেলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না।

মেয়েটার কাটা লাশটা তখন পুলিসে তুলে নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির হেড আপিসে যাবার রাস্তাটার দিকে। এই রাস্তাটি ভারি চমৎকার। রাণীগঞ্জ থেকে সোজা চলে গেছে এগেরা পর্যন্ত। লাল রঙের পাকা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে মস্ত বড় বড় গাছের সারি। মাথার ওপর গাছের ডালপালাগুলো এমনভাবে মিশে গেছে মনে হয় যেন সারাটা রাস্তা চাঁদোয়ায় ঢাকা। স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন সেই রাস্তার দুদিকে

সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। সেই ঘাসের ওপর আমরা শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দেখি সেই রাস্তা দিয়ে একখানা মোটর গাড়ি সোজা যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়ালো আমাদের সুমুখে। গাড়ি চালাচ্ছে একজন ইংরেজ। ভেতরে বসে আছেন একজন বয়স্কা ইংরেজ মহিলা, আর দুজন কিশোরী। আমাদের দিকে তাকিয়ে সাহেব কি যেন বললেন। আমরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। নজরুল আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, আমি তার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। তখন ভেতরের ভদ্রমহিলা নামলেন গাড়ি থেকে। হাত-মুখ নেড়ে তিনি যা বললেন তাও বুঝলাম না। শুধু একটা কথা স্পষ্ট শুনলাম—'আসানসোল'। আন্দাজে বুঝে নিতে হলো। তাঁরা আসানসোল যেতে চান। পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

না পাবার কথাই। মাইল-পাঁচেক উল্‌টো দিকে চলে এসেছেন তাঁরা। যাবেন আসানসোল, চলে এসেছেন এগেরা যাবার রাস্তায়।

আমরা দুজনেই তখন কসরৎ আরম্ভ করলাম—ক্যাচিং দিস্ রোড, গো এ লিট্‌ল্ ব্যাক্, এণ্ড্ দেন্ লেফ্‌ট্ সাইড্, দেন্ রাইট্ এণ্ড এগেন লেফ্‌ট্—

ইংরেজি বলে গলদঘর্ম হয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ পরে যখন নিষ্কৃতি পেলাম তখন আমরা দুজনেই যেন মরমে মরে গেছি।

ছি ছি, আর মাত্র দু'বছর পরেই আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবো অথচ ইংরেজি কথা বুঝতেও পারি না বলতেও পারি না।

প্রতিজ্ঞা করলাম ইংরেজি শিখতে হবে। ফড় ফড় করে ইংরেজের মত ইংরেজি বলবো— ইংরেজি ভাষায় যে কেউ কথা বলুক জলের মত বুঝতে পারবো—তবে তো!

কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?

ঠিক করলাম, কাল থেকে স্কুলের ছুটির পর আড্ডা না মেরে শেকার-সাহেবের কাছে যেতে হবে। শেকার-সাহেব থাকে আমাদের বাড়ির কাছেই। মুসলমান পাড়ার দক্ষিণ দিকে অনেকখানি জায়গা

জুড়ে চমৎকার একটি বাগানের ভেতর পুরনো একটি একতলা বাংলো। সেইখানেই থাকে শেকার-সাহেব। তার বয়স কত জানি না। শুধু জানি সাহেব যুবকও নয়, বুড়োও নয়। থলে হাতে নিয়ে নিজে বাজার করে। মোটা একটা লাঠি হাতে নিয়ে শহরের পথে ঘুরে বেড়ায়। হেসে হেসে কথা বলে। বাংলাও জানে, ইংরেজিও জানে। তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বললেই ঠিক শিখে ফেলবো আমরা।

নজরুল আর আমি দুজনেই গেলাম।

আমাকে চিনতো শেকার-সাহেব। বললে, আয়, বোস্!

নজরুলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম সাহেবের।

সাহেবকে বললাম আমাদের মনের কথা।—তুমি ইংরেজিতে কথা বল আমাদের সঙ্গে। আমরাও বলবো। ইংরেজি আমরা শিখতে চাই।

সাহেব বললে, রোজ চার আনা করে পয়সা দিতে হবে। তোর দু' আনা আর তোর এই বন্ধুর দু' আনা।

বললাম, রোজ মানে এভ্রি ডে উই ক্যান্ নট্ পে ফোর অ্যানাস্।

সাহেব জবাব দিলে বাংলায়। বললে রোজ দিতে হবে না। যেদিন আসবি সেইদিন দিবি। আজ এনেছিস? গাছ-পাকা পেয়ারা খাওয়াবো।

চার আনা পয়সা ছিল আমার কাছে। সাহেবকে দিলাম। দিয়ে বললাম, পেয়ারা মানে—নজরুলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পেয়ারার ইংরেজি কি?

নজরুল বললে, গোয়াভা।

সাহেবকে বললাম, উই হ্যাভ্ নট কাম টু ইউ টু ইট্ গোয়াভা।

সাহেব ইংরেজিতে জবাব কিছুতেই দিচ্ছে না। আবার বাংলায় বললে, খা খা, খেয়ে দেখ্ না। গাছ-পাকা পেয়ারা। ভেরি গুড্।

এই বলে সাহেব তার মেম-সাহেবকে ডাকতে লাগলো।

—মেম-সায়েব! মেম-সাব!

এসে দাঁড়ালো মেম-সাহেব। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। গাউন-

পরা মেম-সাহেব নয়। শাড়ি-পরা এই দেশী মেম। বোধ, করি বাউরি-বাগ্‌দির মেয়ে।

সাহেব বললে, এদের একটি পেয়ারা দাও।

আবার আমাদের দিকে তাকালো সাহেব। বললে, আমার গাছের পেয়ারা। পেঁপে খাবি? আরও চার আনা দে।

বললাম, আবার বাংলায় বলছো সায়েব, ইংরেজিতে বল।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো মেম-সাহেব।

হেসে বললে, ইংরেজি ও জানে নাকি?

নজরুল বললে, নাও শোনো!

মেম-সাহেব বললে, ইংরেজি ও জানতো ছেলেবেলায়। এখন সব ভুলে গেছে।

সাহেব রেগে উঠলো মেম-সাহেবের ওপর। বললে, চোপ্ রও!

হেসে ফেললাম আমি।

নজরুলের টিপ্পনী কাটা অভ্যাস। বললে, নাও ঠেলা!

মেম-সাহেবও হাসলো।

সেদিনের মত আমরা পেয়ারা খেয়েই চলে এলাম।

বাইরে এসে নজরুল বললে, লোকটা ইংরেজ নয়। মিছেমিছি এলে এখানে।

আমি কিন্তু আশা ছাড়তে পারিনি। প্রায়ই যাই সাহেবের কাছে। দু'চার আনা প্রণামী দিয়ে কোনোদিন পেয়ারা কোনোদিন পেঁপে খেয়ে আসি।

পয়সা নেয় কিন্তু ইংরেজিতে কথা সে কিছুতেই বলতে চায় না—সাহেব ভারি পয়সার কাঙাল। কিন্তু মেম-সাহেব ঠিক তার উল্‌টো। সাহেব পয়সা রাখতে ঘরে ঢোকে আর মেম-সাহেব দুটোর জায়গায় চারটে পেয়ারা আমাদের পকেটে পুরে দিয়ে বলে, যাও, পালাও এখান থেকে।

যেতে যেদিন সন্ধ্যে হয়ে যায়, আব্‌ছা-আব্‌ছা অন্ধকার নেমে আসে শেকার-সাহেবের পেয়ারা-বাগানে, সেইদিনই দেখি—চুপিচুপি চোরের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে দুগিয়া বেরুচ্ছে সাহেবের বাংলো থেকে।

একদিন বললাম, এই ছুগিয়া, রোজ রোজ তুই এখানে আসিস কেন রে? চুরি করবার মতলব?

ছুগিয়া বললে, মা না চুরি করতে আসি না। মেম-সায়েব আমাকে খেতে দেয়। তাই চুপিচুপি খেয়েই পালিয়ে যাই। সায়েব দেখলে রাগ করে।

সেদিন অমনি রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। গলির মোড়ে কেরোসিনের বাতিটাকে ম্লান করে দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না নেমেছিল সন্ধ্যারাত্রেই। শেকার-সাহেবের বাংলোর ভেতরে আর ঢুকতে হলো না। ফটকের কাছ থেকেই দেখি—হুলুস্থুল কাণ্ড। সাহেব খুব রেগেছে। মোটা সেই লাঠিগাছটা হাতে নিয়ে চেঁচাচ্ছে—তুমি থামো। তুমি চেঁচিয়ো না। এ ঠিক ওরই কাজ।

মেম-সাহেব বলছে, না, ওর কাজ নয়।

সাহেব বললে, নিশ্চয়ই ওর কাজ।

—বলছি সে আসেনি, তবু বলে—

—কিছু বলতে হবে না। আমি চললাম।

সাহেব রেগে একেবারে টং হয়ে গিয়ে বেরিয়ে এলো বাংলো থেকে। আমরাও চুপিচুপি তার পেছন নিলাম। ছুগিয়া নিশ্চয়ই কিছু চুরি করেছে। কথা শুনে তাই মনে হলো।

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

ঘটনাটা ঘটলো একেবারে আমাদের বাড়ির সামনেই। রাণীগঞ্জ শহরের সদর রাস্তার ওপর

ওদিক থেকে মনের আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে আসছে জন মণ্ডল আর ছুগিয়া। এদিক থেকে লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শেকার-সাহেব।

—এই ব্যাটা ছুগিয়া, দে আমার ঘড়ি দে।

ছুগিয়া বললে, ঘড়ি! তোমার ঘড়ি হাম নাহি জানতা।

কথাটি বললে ঠিক আমিরী মেজাজে।

মনে হলো দুই বন্ধু বেশ ভাল করে মদ্যপান করেছে।

শেকার-সাহেব তখন জন মণ্ডলকে ধরে বসলো—ঘড়িটা ও ঠিক তোমাকে দিয়েছে।

খুব জোরে-জোরে জন মণ্ডল বলে উঠলো, নো নো নো স্যার, ইদানীং ওর হাত দিয়ে কোনও ঘড়ি আমদানি হয়নি।—ইউ বিলিভ্ মি। আই এম্ নট্ এ থিফ্ লাইক মাই ফ্রেণ্ড ছুখীরাম। প্লিজ গো হোম। ডোণ্ট্ ডিস্টার্ব আস্। ছুগিয়া, গান ধর্ !

—এই যে ধরাচ্ছি। বলেই শেকার-সাহেব তার হাতের লাঠিটা চালিয়ে দিলে জন মণ্ডলের ওপর।

লাঠি খেয়েই জন মণ্ডল কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। চারিদিকে দিনের মত জ্যোৎস্নার আলো। তবু দেখতে পেলাম না কোন্‌দিক দিয়ে কেমন করে সে পালিয়ে গেল।

একা দাঁড়িয়ে রইলো ছুগিয়া।

সাহেব বললে, দে আমার ঘড়ি দে।

—ঘড়ি আমি জানি না।

—তবে রে ! সাহেব প্রাণপণে ছুগিয়ার মাথার ওপর বসিয়ে দিলে তার সেই মোটা লাঠিটা। ছুগিয়া হাত ছুটো তুলে লাঠিটা বোধ হয় কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ ছুগিয়া পারলে না কেড়ে নিতে। না পারলে কেড়ে নিতে, না পারলে ছুটে পালাতে। বসে পড়লো রাস্তার ওপরেই। সাহেবের লাঠি তখনও সমানে চলেছে। মাথায়, গায়ে, পিঠে—ছুমাছুম্ বাড়ি ! যে-ছুগিয়াকে মার খেয়ে কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি সেই ছুগিয়া রাস্তায় রাঙা ধুলোয় পড়ে 'বাবা রে' 'বাবা রে' বলে চেঁচাতে লাগলো।

লোক জড়ো হয়ে গেল চারিদিক থেকে।

কেউ বললে, ছুগিয়া মরে গেছে।

কেউ বললে, মাথাটা ওর ফেটে গেছে। মরেনি এখনও।

শেকার-সাহেব সত্যিই যখন দেখলে রাণীগঞ্জের রাঙা ধুলোর ওপর রাঙা রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ছুগিয়ার মাথা থেকে, তখন সে বাড়ি ফেরবার জন্যে পেছন ফিরলো।

যেই পেছন ফিরেছে, দেখলে মেম-সাহেব আসছে ছুটতে ছুটতে তারই দিকে।

—এই নাও তোমার ঘড়ি। এক জায়গায় রাখবে, আর খুঁজবে আর-এক জায়গায়।

হঠাৎ তার নজর পড়লো ছুগিয়ার দিকে। হেঁট হয়ে তাকে ভাল করে দেখেই শেকার-সাহেবের কোটটা চেপে ধরে বললে, এ কী করেছ তুমি? এই তো সামনেই থানা। এক্ষুনি যে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে।

সাহেব তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

বললে, ছাখো যদি সামলাতে পারো। যত টাকা লাগে আমি দেবো।—আমি যে মেরেছি তার প্রমাণ কি?

থানা থেকে দারোগাবাবু নিজে এলেন। লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে তুলে নিয়ে গেল ছুগিয়াকে। মেম-সাহেব তাদের সঙ্গে গেল।

সবাই চলে যাবার পর রাস্তার ধারের পাকা নর্দমা থেকে হুস্ করে মাথা তুলে উঠলো জন মণ্ডল।—ব্যাটা দিলে আমার নেশাটি নষ্ট করে। আবার যাই। খেয়ে আসি একটুখানি।

•

না, ছুগিয়া মরেনি।

ছুগিয়ারা অত সহজে মরে না।

পরের দিন দেখা গেল হাসপাতাল থেকে আসছে ছুগিয়া। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সঙ্গে আসছে মেম-সাহেব আর একজন কনস্টেবল।

দেখলাম থানায় গিয়ে ঢুকলো তারা।

পিছু পিছু ছুটলাম মজা দেখতে।

দারোগাবাবুর খুব চেনা মানুষ ছুগিয়া। বললেন, কি খবর ছুখীরাম, মরেছিলে যে!

ছুগিয়ার মুখে সেই হাসি!—হ্যাঁ বাবু, মরেছিলাম।

দারোগাবাবু বললেন, এইবার তুমি একদিন আমার হাতে, প্রাণটা দেবে।—মদ খাস্ কেন ?

ছুগিয়া বললে, আমি খুব তাড়াতাড়ি মরে যেতে চাই বাবু, আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ ?

এই বলে সে একবার তাকাল মেম-সাহেবের দিকে।

দারোগাবাবুও দেখলেন মেম-সাহেবকে। বললেন, তোমাকে বুঝি শেকার-সাহেব পাঠিয়েছে ? ছুগিয়াকে বলতে এসেছ বুঝি—কেসটা যাতে আদালতে না যায় ?

মেম-সাহেব মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনও কথা বললে না।

দারোগাবাবু ছুগিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাহেবের বাংলোয় কেন গিয়েছিলি তুই ? চুরি করবার মতলব ছিল ?

ছুগিয়া বললে, না বাবু, মেম-সায়েব আমাকে খেতে দেয়, তাই খিদে পেলেই যাই।

—মেম-সাহেব তোকে বুঝি খুব ভালবাসে ?

ছুগিয়া বললে, ভালোবাসে না ছাই! আমি মরে গেলেই রাক্কুসী বাঁচে!

দারোগাবাবু ধমক দিলেন।—ছি! ওকে তুই রাক্কুসী বলছিস ?

ছুগিয়া তাকালো মেম-সাহেবের দিকে। বললে, বলবো ? বলে দেবো ?

মেম-সাহেব বললে, হ্যাঁ তুই বল্—আমি আর বারণ করবো না তোকে।

ছুগিয়া যা বললে, শুনে তো আমরা অবাক!

ছুগিয়া বললে, ওই তো আমার মা।

দারোগাবাবু জানতেন না কথাটা।

শহরের কেউ জানতো না।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তাহ'লে শেকার-সাহেব তোর বাবা ?

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় মুখখানা বিকৃত করে ছুগিয়া বললে, ধেৎ, ও আমার

খাবা কেন হবে? আমার বাপ্ কলিয়ারীতে কাজ করে। আমার মাকে ছেড়ে দিয়েছে।

এই বলে হঠাৎ কী যে হলো তার, মা মা বলে মেম-সাহেবের কাছে গিয়ে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো।—আমি আর কোনো দিন তোর কাছে যাব না। খেতে না পেয়ে যদি মরেও যাই তবু আমি কোনোদিন তোকে বিরক্ত করবো না।

যে-ছুগিয়ার চোখের জল সহজে বেরোয় না সেই ছুগিয়া কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লো মেম-সাহেবের পায়ের কাছে।

মেম-সাহেব বললে, কাঁদতে হবে না হতভাগা, ওঠ্। চল্ আমরা কোনো দিকে চলে যাই। সাহেবের কাছে আমি আর যাব না।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

রাণীগঞ্জ ছেড়ে কেউ কোথাও যায়নি।

মেম-সাহেবকে দেখলাম আবার সেই শেকার-সাহেবের বাংলোয় কাজ করছে, ছুগিয়াকে দেখলাম রাণীগঞ্জ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইউরোপে তখন চলছে প্রথম মহাযুদ্ধ। ভারতবর্ষে চলছে একটি ভাবের বন্যা। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। ইংরেজকে তাড়াতে হবে।

আমরা কিশোর বালক— ইস্কুলের ছাত্র। আমাদেরও মনে সেই একই ভাবের বন্যা। ইংরেজকে তাড়াতে হবে দেশ থেকে। আমাদের তখন রক্ত গরম। কাউকে তাড়াতে হলে জানি শুধু মেরে তাড়াতে হয়।

কিন্তু ইংরেজকে মারবো কেমন করে? আমাদের না আছে বন্দুক, না আছে কোনো অস্ত্র।

এমনদিনে হঠাৎ একদিন দেখা গেল—নানারকমের পোস্টারে পোস্টারে রাণীগঞ্জ শহরটা ছেয়ে ফেলেছে।

'বাঙ্গালী পল্টন! বাঙ্গালী পল্টন! বাঙ্গালী পল্টন!'

সে-সব পোস্টারের ভাষা আজ আর আমার মনে নেই শুধু

মনে আছে—রক্ত-গরম-করা বাছা বাছা বাক্য দিয়ে রচিত সে বিচিত্র রঙ-বেরঙের পোস্টারগুলি আমাদের শুধু চোখকে আকর্ষণ করেনি—রক্তেও দোলা দিয়েছিল।

'কে বলে বাঙ্গালী নির্বীর্য? কে বলে বাঙালী শক্তিহীন? আসুন—বাঙ্গালী যুবকরা দলে দলে যোগ দিন! বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করুন!'

এই রকম সব নানা ভাষায় নানা রকমের পোস্টার দেখে দেখে নজরুল আর আমি ভাবলাম—এই সুযোগে যুদ্ধ করবার কৌশলটা শিখে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

আমাদের তখন যেই ভাবনা সেই কাজ।

চুপিচুপি নাম লিখিয়ে আমরা যুদ্ধে চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হলো না। সব জানাজানি হয়ে গেল। সারা রাণীগঞ্জ শহর জেনে ফেললে—যুদ্ধে যাবার জন্যে আমরা দুজন নাম লিখিয়ে এসেছি আসনসোলে এস-ডি-ও সাহেবের কাছে।

তখনকার দিনে সকলের ধারণা ছিল যুদ্ধে যাওয়া মানে চিরদিনের জন্য চলে যাওয়া। যুদ্ধে যে যায় সে আর ফিরে আসে না।

অনেকে আমাদের ধরে বসলো—তোমরা দয়া করে দুগিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাও। রাণীগঞ্জ শহরটা ঠাণ্ডা হোক্।

দুগিয়া তালপাতার সেপাই—ও কি করবে? ওকে নেবে কেন?

অনেকে বলতে লাগলো, চাকর, ঝাড়ুদার, মেথর—এইরকম একটা কাজে লেগে যাবে। তোমরা ওকে নিয়ে যাও।

কথাটা শুনে দুগিয়ার ভারি আনন্দ। হরদম আমাদের কাছে পা টিপতে আরম্ভ করলে।—চল, আমাকে নিয়ে চল তোমরা। ভারি মজা হবে।

বললাম, মজা তো হবে, কিন্তু তোর ট্রেনের ভাড়া কে দেবে?

দুগিয়া বললে, কত লাগবে?

এখান থেকে কলকাতা যাবার ভাড়াটা যোগাড় কর। তারপর যদি আমাদের সঙ্গে তোর যাওয়া হয়—তখন আর ভাড়া লাগবে না।

যদি না যাওয়া হয়, তোকে যদি না নেয়, তাহ'লে আবার ফিরে আসতে হবে কিন্তু।

সে আমি ঠিক যোগাড় করবো।

ভেবেছিলাম টাকা যোগাড় করতে পারবে না। ছগিয়ার যাওয়াও হবে না।

কিন্তু আমাদের কলকাতা যাবার দিন, ঠিক দেখি আমাদের আগেই ছগিয়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—কি রে যাবি নাকি? টিকিট করেছিস?

ছগিয়া বললে, করেছি।

সে এক বিচিত্র সাজে সেজে এসেছে ছগিয়া। একজোড়া পুরনো জুতা যোগাড় করেছে। একজোড়া মোজা পরেছে। নতুন হাফ প্যাণ্ট আর লাল রঙের একটি হাতকাটা শার্ট গায়ে দিয়েছে। মাথায় একটি টুপি।

—কোথায় পেলি এ-সব?

চুপ করে রইলো ছগিয়া। কোনও জবাব দিলে না।

দেখলাম, খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট রয়েছে তার হাতে। জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কি?

এবারও জবাব দিলে না। কি যেন ভাবছে সে।

ট্রেন আসতেই আমাদেরই সঙ্গে একই কামরায় উঠে বসলো ছগিয়া। খোলা জানলার পাশে বসে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আবাল্য পরিচিত তার এই রাণীগঞ্জ শহরটিকে ছেড়ে যেতে বোধ হয় তার কষ্ট হচ্ছে, তাই মনে হচ্ছে রাণীগঞ্জকে যেন শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছে।

—কি রে, জন মণ্ডলকে মনে পড়ছে বুঝি?

এবারেও চুপ। এত গম্ভীর হতে তাকে আমি কখনও দেখিনি। মদ্যপানের কথা মনে পড়েছে কিনা তাই-বা কে জানে!

এই সব আকাশ-পাতাল যখন ভাবছি তখন গাড়ি ছেড়ে দিল।

প্ল্যাটফর্মের ওপর শহরের বিস্তর লোক। ইস্কুলের ছেলেই হবে

জন-তিরিশেক। সবাই এসেছে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে। গাড়ি ছাড়তেই তারা একসঙ্গে বার বার বলতে লাগলো—'বন্দে মাতরম্' 'বন্দে মাতরম্'!

আমরা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। 'বন্দে মাতরম্' তারা কেন বলছে বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালী ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে—একটা কিছু বলতে হয় তাই হয়ত বলছে 'বন্দে মাতরম্'। নইলে আমাদের মনে গোপন বাসনা যাই থাক, দেশমাতৃকার কোনও কাজেই আমরা যাচ্ছি না। ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া মানে ইংরাজকে সাহায্য করা। ইওরোপে তখন যে যুদ্ধ চলছে সে যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও সম্বন্ধ নেই। সেটুকু আমরা বেশ ভাল করেই বুঝি। তাই মনে মনে হাসি পাচ্ছিল।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ আমার নজরে পড়লো—স্টেশনের নাম-লেখা বোর্ডটা যেখানে আছে, তারই একপাশে দাঁড়িয়ে আছে শেকার-সাহেবের মেম-সাহেব—দুগিয়ার মা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমাদের কামরার দিকে।

দেখলাম চলন্ত গাড়ির ভেতর জানালার কাছে মুখ বাড়িয়ে দুগিয়াও তাকিয়ে আছে তার মায়ের দিকে।

গাড়িটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। দুগিয়া মুখ ফেরালে। দেখলাম তার চোখ দুটি চিক্‌চিক্ করছে।

দুগিয়ার খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেটটি হঠাৎ বেঞ্চি থেকে পড়ে গেল নজরুলের পায়ের কাছে। নজরুল সেটি কুড়িয়ে নিয়ে বললে, এটা কি রে?

দুগিয়া জবাব দেবার আগেই নজরুল কাগজটা খুলে ফেললে। দেখা গেল উলের একটি হাতে-বোনা সোয়েটার।

নজরুল বললে, কোথাও মৃগয়া করেছিস নাকি?

মৃগয়া কথাটার মানে জানে না দুগিয়া। তাই সে জবাব দিলে, না না, কিনবো কেন? মা দিয়েছে।

সোয়েটারটি নজরুল তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, নে, ভাল করে জড়িয়ে রাখ্।

বাইরে জ্যোৎস্না রাত্রি—দিনের মত পরিষ্কার। তারই ভেতর দিয়ে ট্রেন চলছে। নজরুল আর আমি গল্প করছি, হুগিয়া তার সেই সোয়েটারের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে ট্রেনের কামরাটা যেন চষে বেড়াচ্ছে। একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসতে, কোথাও এক জায়গায় চুপ করে বসছে না কিছুতেই।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। প্রতিটি স্টেশনে একবার করে দাঁড়াচ্ছে। আর যেই দাঁড়াচ্ছে, হুগিয়া দরজা খুলে নেমে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। নজরুল বললে, বার বার নামছিস কেন হতভাগা, উঠতে না পারলে মরবি যে!

হাসতে হাসতে উঠে বসলো হুগিয়া। বললে, আর নামবো না।

মুখে বললে নামবো না, কিন্তু যে-কোনো স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে, আর হুগিয়া দোরের কাছে গিয়ে নামবার জন্যে উস্‌খুস্‌ করছে।

কেন সে এরকম করছে বুঝতে পারলাম গিয়ে বর্ধমান স্টেশনে। গাড়ি যখন হাওড়ায় পৌঁছোবে তখন বোধ করি সকাল হয়ে যাবে। রাত্রে কিছু খাওয়া দরকার। বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি থেকে আমরাও নামলাম। তিনজনের জন্যে তিনটে জায়গায় খাবার নিয়ে গাড়িতে উঠে দেখি হুগিয়া নেই।

হুগিয়ার খাবারটা রেখে দিয়ে আমরা খেয়ে নিলাম।

গাড়ি যখন ছাড়বার হুইসিল্‌ দিয়েছে তখনও পর্যন্ত হুগিয়া এলো না দেখে আমি নজরুলকে বললাম, ব্যাটা বোধ হয় পালালো।

নজরুল বললে, না পালাবে না। বোধ হয় টিকিট কাটেনি, তাই চেকারের ভয়ে ওরকম করছে।

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না কথাটা। মনে হলো রাণীগঞ্জের জন্যে ওর মন কেমন করছে, ও ঠিক আবার রাণীগঞ্জে ফিরে যাবে।

কিন্তু না, আমার কথাটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে চলন্ত গাড়িতে দেখলাম টুক্ করে উঠে পড়লো হুগিয়া।

—কোথায় গিয়েছিলি এতক্ষণ?

হুগিয়া বললে, কলে জল খেতে গিয়েছিলাম।

শালপাতায় মোড়া তার খাবারটা দেখিয়ে দিয়ে নজরুল বললে, এইবার এইগুলো খা।

ছুগিয়া খুব মনের আনন্দে হাসতে হাসতে খেলে বটে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হলো তার তৃপ্তি হলো না। বললে, মিষ্টি যে তোমরা কেমন করে খাও মাইরি—ঝাল-ঝাল চানাচুর কিনতে পারলে না? এই ছাখো, এইবার জল কোথায় পাই?

—গাড়ি থামুক তারপর জল খাবি।

বললাম,—তার এখনও দেরি আছে। ব্যাণ্ডেলে জল পাবি।

দেরি সহ্য হবে না ছুগিয়ার। সে উঠলো।

কামরাটা মস্ত বড়। লোকজনও বেশি নেই। কামরার একেবারে শেষপ্রান্তে ছুগিয়ার সন্ধানী চোখ ঠিক বের করে ফেলেছে হিন্দুস্থানী একটি মেয়ে এক কুঁজো জল বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। ছুগিয়া তাকে কি বললে ঠিক শোনা গেল না। মেয়েটি জল দিতে রাজী হয়েছে, কিন্তু গ্লাস দিতে রাজী নয়।

শেষে রফা করে ফেললে ছুগিয়া। বললে, বাণ্ডিল-ইস্টিশনে সে তাকে এক কুঁজো জল এনে দেবে। আপাততঃ কুঁজো থেকে তার হাতের ওপর জল ঢেলে দিলেই সে ঠিক খেয়ে নেবে।

তারপর এক বিচিত্র ভঙ্গীতে তার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি মুখের কাছে তুলে ধরে মেয়েটির পায়ের কাছে বসল ছুগিয়া, আর মেয়েটি কুঁজো থেকে জল ঢালতে লাগলো তার হাতের ওপর। কঁক্ কঁক্ করে আওয়াজ হতে লাগলো শুধু, একফোঁটা জল এদিক-ওদিক কোথাও গড়িয়ে পড়লো না, মুহূর্তের মধ্যে কুঁজোর জলটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে ছুগিয়া এসে বসলো আমাদের সুমুখে। বললে, দাও এবার চারটে পয়সা দাও, চানাচুর খাব।

বললাম, চানাচুর খেতে হয় না। পয়সা নেই।

—নেই তো নেই। বলে তার পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে দেশলাই খুঁজে বেড়াতে লাগলো এর-ওর কাছে। একজন যাত্রীর কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে ছুগিয়া আরাম করে সেইখানে বসে বসেই-ধূমপান শুরু করে দিলে।

ছোট ছোট কয়েকটি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। ভুগিয়া নামলো আর উঠলো। না, চানাচুর নেই।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলার কুঁজোটি নিয়ে ভুগিয়া নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে। তারপর কুঁজোভর্তি জল নিয়ে যেই সে কামরায় ঢুকতে যাবে, দেখলে চেকার তখন টিকিট চেক্ করছে। ভুগিয়া আর ঢুকলো না কামরায়। কুঁজোটি জানলার পথে মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে মুহূর্তে সে উধাও হয়ে গেল।

চেকার নেমে গেল গাড়ি থেকে। ভুগিয়া তবু আসে না।

এলো যখন, গাড়ি তখন আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

এসেই সে তার পকেট থেকে তিনটি চানাচুরের প্যাকেট বের করে ধরলে আমাদের সুমুখে। বললে, নাও খাও। খুব ভাল লাগবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, পয়সা কোথায় পেলি ?

—পেলাম যেখানে হোক, তোমরা খাও না !

বললাম, এত রাত্রে চানাচুর খায় না। তুই খা।

পরমানন্দে তিন প্যাকেট চানাচুর সে নিজেই খেয়ে ফেললে।

বললাম, টিকিট তো কাটিসনি, লিলুয়ায় যখন টিকিট নিতে আসবে তখন কি করবি ?

— সে ভাবনা তোমাদের ভাবতে হবে না।

—তোকে ঠিক নামিয়ে দেবে গাড়ি থেকে।

—তার পর ?

—তার পর জেল।

ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো ভুগিয়া।

ভয়-ডর বলে তার কোনও বস্তুই নেই।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখনকার মত আগেকার দিনে ট্রেনে অত ভিড় হতো না। হাত-পা ছড়িয়ে শোবার বসবার জায়গা পাওয়া যেতো।

আমাদের ঘুম যখন ভাঙলো, দেখলাম পূবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। এরকম সকাল আরও অনেক দেখেছি, কিন্তু সেদিনের সেই

সকালটি কেন জানি না, আমার মনে একটি অবিস্মরণীয় ছাপ্ রেখে গেছে।

দেখতে দেখতে ট্রেন এসে দাঁড়ালো লিলুয়া স্টেশনে। হুগিয়াকে সাবধান করে দেবো বলে এদিক-ওদিক তাকালাম, কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। আমরা নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে হবে।

চা খেতে খেতে হুগিয়ার নাম ধবে ডাকলাম বাবকতক। কিন্তু কোথায় হুগিয়া ?

ভেবেছিলাম ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ত বা হুস কবে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তাও এলো না। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

নজরুল বললে, হয়ত সে ধরা পড়ে গেছে। লিলুয়াতেই আট্‌কে বেখেছে তাকে।

মরুক্‌গে যাক্, হুগিয়াব কথা আব ভাববো না।

হাওড়ায় এসে গাড়ি দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে সবাই নেমে যাচ্ছে। আমরাও নামলাম।

গেটেব দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, হঠাৎ দেখি—জনস্রোতের ভেতর থেকে বেবিয়ে হাসতে হাসতে হুগিয়া আসছে আমাদেব দিকে এগিয়ে।

—কোথায় ছিলি হতভাগা ?

কোনও জবাব দিচ্ছে না। শুধু হাসছে।

কলকাতা সে কখনও দেখেনি। ট্রামগাড়ি দেখে অবাক !

—এব ইঞ্জিন কোথায় ?

বললাম, ট্রামে ইঞ্জিন থাকে না। ইলেকট্রিকে চলে।

—এই গাড়িতে চড়বে তো ?

—হ্যাঁ, এতেই তো চড়তে হবে।

হুগিয়া বললে, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি, কেন ট্যাসকিতে চল না !

রাণীগঞ্জে তখন ট্যাক্সি চালু হয়নি। বললাম, ট্যাস্‌কি তুই শুনলি কোথায় ?

ছুগিয়া বললে, গাড়িতে আসতে আসতে লিলুয়ায় বলছিল একটা লোক।

বললাম, ট্যাক্সির ভাড়া কে দেবে ?

ছুগিয়া বললে, আমি দেবো।

অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। ছুটি-চারটি পয়সার জন্মে যে চুরি-চামারি করে, টাকা নেই বলে ট্রেনের টিকিট পর্যন্ত কাটতে পারলে না, সে বলে কিনা ট্যাক্সির ভাড়া দেবে ?

—টাকা তুই পাবি কোথায় ?

ছুগিয়া বললে, আসবার সময় মা দিয়েছিল দশ টাকা। টিকিট না কেটে টাকাটা বাঁচালাম। তারপর এই গাড়িতে রোজগার করলাম এই ছাখো—দশ টাকার ছুখানা নোট।

এই বলে সে নোট ছুখানা দেখালে আমাকে।

বললাম, ট্রেনে চুরি করলি হতভাগা ? চুরি না করে তুই কি থাকতে পারিস না ?

—ধেৎ, চুরি কেন করবো ?

এই বলে পথ চলতে চলতে নজরুলকে বুঝাতে আরম্ভ করলে : সেই যে মেয়েটি আমাকে জল খেতে দিলে, তার পায়ের কাছে আমি বসলাম হাত পেতে, আর সে আমার হাতের ওপর কুঁজো থেকে জল ঢালতে লাগলো, জল খেতে খেতে আমার নজরে পড়লো মেয়েটির পায়ের কাছে দলা-পাকানো এই নোট ছুটি পড়ে রয়েছে। উঠে আসবার সময় সেটি কুড়িয়ে নিয়ে আমি চলে এলাম। একে চুরি করা বলে ? আচ্ছা তুমিই বল তো !

নজরুল বললে, তুই চোর-ভগবান। ভগবানও কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি কাজ করেন, তুইও তাই করিস। তবে ভগবান চুরি করেন না—প্রতারণা করেন না—আর তুই চুরিও করিস, প্রতারণাও করিস—এইখানেই ভগবানের সঙ্গে তোর তফাৎ।

ছুগিয়া হে হে করে হাসতে লাগলো।—আমি ভগমান ? হে হে আমি ভগমান ? তুমি বেশ কথা বল মাইরি !

নজরুল বললে, আর বেশি কথা বলিস না—আমার হাতে মার

খেয়ে মরে যাবি। যেমন চুপিচুপি এসেছিস তেমনি চুপিচুপি চল্ আমাদের সঙ্গে।

নজরুলের হাতে মার খাওয়ার ভয়েই বোধ করি ছুগিয়া আর কোনও কথা বললে না। আমাদের পিছু পিছু ট্রামে উঠলো।

কথা ছিল আমাদের কলকাতার (সুকিয়া স্ট্রীট) বাসায় গিয়ে উঠবো প্রথমে। সেখানে স্নান-খাওয়া সেরে চলে যাব রিক্রুটিং আপিসে। হেদোর উত্তরদিকে বিডন স্ট্রীটের ওপর লালরঙের যে বাড়িটা এখনও রয়েছে, তারই নীচের তলায় রিক্রুটিং আপিস।

সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ঢুকতেই দেখি মামা দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখেই বললেন, আয়। বোস্।

নজরুলকে দেখে বললেন, এই বুঝি তোর বন্ধু—সেই মুসলমান ছেলেটি?

বললাম, হ্যাঁ।

নজরুল প্রণাম করলে আমার মামাকে। মামা বললেন, বোসো। রাত জেগে ট্রেনে এসেছ, স্নানটান করে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও। কাল আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব রিক্রুটিং আপিসে।

বলেই তিনি তাকালেন ছুগিয়ার দিকে।—এটি কে রে? এও কি তোদের সঙ্গে এসেছে নাকি?

ছুগিয়ার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মামা বোধ করি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—যুদ্ধে গিয়ে সে কি করবে!

বললাম, ও কিছুতেই ছাড়লে না, চলে এলো আমাদের সঙ্গে। চাকর-বাকরের কাজ যদি পায় তো যাবে সেখানে, নয়ত আবার ফিরে যাবে রাণীগঞ্জে।

মামা বললেন, ভাল। কিন্তু এ দুর্মতি তোমাদের কেন হলো বুঝতে পারছি না। লেখাপড়া উজিয়ে দিয়ে এলে চিরজন্মের মত—অথচ সেদিক দিয়ে তোমরা দুজনেই তো ভাল ছেলে।

আমাদের বাড়িতে রেখে মামা বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে যখন এলেন, আমাদের স্নান-খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে।

তখন কি আর জানি—মামা কোথায় গিয়েছিলেন। জানলাম তার পরের দিন রিক্রুটিং আপিসে গিয়ে।

মস্ত বড় একটা খাতায় নাম ঠিকানা ইত্যাদি যিনি লিখছিলেন আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে মামা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, এই যে—এদের এনেছি, পরীক্ষা করুন।

প্রথমেই নজরুল গেল। নাম ঠিকানা লিখে শরীরের ওজন নিলেন, তারপর দর্জি যেমন করে জামার মাপ নেয় তেমনি একটি ফিতে দিয়ে বুকের মাপ নেওয়া হলো, উচ্চতা মাপা হলো, তারপর বললেন, ঠিক আছে। আপনি এইদিকে বসুন। আমাদের গাড়ি আপনাদের ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যাবে।

এইবার আমার পালা। নাম ঠিকানা লেখা হলো, তারপর ফিতে দিয়ে বুকের মাপ নিয়ে বললেন, আধ ইঞ্চি ছোট। আপনাকে নেওয়া হলো না।

মামা বললেন, আন্‌ফিট্ হয়ে গেল!

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। মিলিটারি আইন-কানুন খুব কড়া।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হবে তাহ'লে?

—যেখান থেকে এসেছে সেইখানে ফিরে যাবে। রোজ খুব করে সাঁতার কাটবে। মাস তিনেক পরে ছাতির মাপ আধ ইঞ্চি বড় হলে তখন আবার আসবে।

আমার মুখখানা তখন শুকিয়ে গেছে। অনেক করে বললাম ভদ্রলোককে।—আধ ইঞ্চি ছোট হয়েছে—তাতে কি! দুদিন এক্সারসাইজ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে নিয়ে নিন স্যার।

লোকটি কিছুতেই রাজী হল না।—না না, তা হয় না। এখন যাও, তিন মাস পরে আসবে। Next?

দুগিয়া গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর কাছে। দুগিয়ার দিকে তাকিয়েই তিনি হেসে ফেললেন।—তুমি কি জন্যে এসেছ? হবে না, যাও।

মামা বললেন, আপনাদের সারভেণ্ট, সুইপারের তো দরকার হবে!

লোকটি বললে, হ্যাঁ, সুইপার দরকার হবে। বল তোমার নাম বল।

বলেই আর-একটা খাতা টেনে নিয়ে দুগিয়ার নাম, তার বাপের নাম, তার ঠিকানা—সব-কিছু লিখে নিয়ে বললে, তোমার আর মাপ-জোপের দরকার হবে না। যাও ওইখানে গিয়ে বোসো।

হাসতে হাসতে নজরুলের পাশে গিয়ে বসলো দুগিয়া।

আমার মামা তখন আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে পারলে বাঁচেন। আমার হাতে ধরে বললেন, আয়। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

হবে না কিছুই। যা হবার তা হয়ে গেছে। তবু সেখান থেকে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমার চোখে তখন জল এসে গেছে। দুগিয়াও চলে যাচ্ছে। আমিই শুধু পেছনে পড়ে রইলাম।

নজরুলের দিকে তাকিয়ে আছি। তারও চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে। হাত তুলে বললে, সেখানে পৌঁছেই আমি চিঠি লিখবো। জবাব দিও।

নজরুলের চিঠির আশায় হাঁ করে তাকিয়ে আছি।

চিঠি এলো প্রায় এক মাস পরে। চারটি পাতা জুড়ে মস্ত বড় চিঠি।

তখনকার দিনে এরোপ্লেন ছিল না। চিঠিপত্র আসতে যেতে অনেক দেরি হতো। প্রতি মাসে একখানা—কখনও বা দু'খানা চিঠি আসতে লাগলো।

আমি কিন্তু রাণীগঞ্জে আর ফিরে যাইনি। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারিনি সেখানে। সোজা একেবারে বীরভূম জেলার একটি ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায় এলাম কলেজে পড়তে।

নজরুলের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ তেমনি চলতে লাগলো।

সব খবরই সে আমাকে জানায়। শুধু দুগিয়ার খবর কিছু লেখে না।

অনেকদিন পরে একদিন হুগিয়ার খবর জানতে চাইলাম।

জবাবে লিখলে, হুগিয়ার সঙ্গে আমার দেখা বড়-একটা হয় না। একদিন মাত্র সে এসেছিল আমার কাছে। গায়ে-গতরে মাংস লেগেছে। চেহারাটা ভালই হয়েছে দেখলাম।

তারও মাস-দুই পরে নজরুলের একখানা চিঠি পেলাম। তাতে সে হুগিয়ার খবর বিস্তারিত ভাবে লিখেছে। লিখেছে—একজন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনের কাছে তার চাকরি হয়েছিল। বেশ ভালই ছিল হতভাগা। হঠাৎ একদিন সাহেবের এক বোতল বিলিতি মদ চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ধরা পড়ে গিয়ে শাস্তি পেয়েছিল। মিলিটারী শাস্তি তার বোধ করি সহ্য হয়নি। তাই সে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখান থেকে পালানো বড় সহজ কথা নয়। তখন সে নানারকম ফন্দী-ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অসুখ-বিসুখ করলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে পালানো সোজা। কিন্তু হতভাগার অসুখ সহজে হয় না। পেট কামড়াচ্ছে বা মাথা ধরেছে বললে হাসপাতালে নেবে না। বড় জোর দু'মাত্রা ওষুধ খাইয়ে ছেড়ে দেয়। সাংঘাতিক কিছু একটা হওয়া দরকার। কার কাছে যেন শুনেছিল—খানিকটা কাঁচ গুঁড়ো করে খেয়ে ফেলতে পারলে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। তাই সে করেছিল একদিন। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতেই সোজা হাসপাতাল।

তারপর তার আর কোনও খবর পাইনি।

হাসপাতাল থেকে কোথায় গেল জানি না।

বোধ করি স্বর্গে ট্র্যানস্ফার হয়ে গেছে।

মর্ত্যধামে থাকলে একদিন-না-একদিন দেখা হতো।

তারপর আর হুগিয়ার খবর নজরুল কিছু রাখেনি।

তার দৃঢ় বিশ্বাস সে মারা গেছে। কাঁচের গুঁড়ো খেয়ে বোধ হয় মানুষ বাঁচে না।

নজরুল খবর না রাখলেও আমি হুগিয়ার খবর পেয়েছি।

আমি তখন কলকাতার একটি হোটেলে থাকি।. নজরুল তখন করাচীতে।

কলকাতার রাস্তায় সুকিয়া স্ট্রীটের একজন কর্মচারী ফণীর সঙ্গে আমার দেখা। সে বললে—আপনাদের সেই ছুগিয়া একদিন এসেছিল সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছে সে?

—কলকাতায় কোন্ এক কুমার বাহাদুরের খাস খানসামার কাজ করে। দেখে মনে হলো বেশ ভালই আছে সে।

—আমরা তো ভেবেছিলাম ছুগিয়া মরে গেছে!

ফণী বললে, ছুগিয়ারা সহজে মরে না।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার চোখে নজরুল

নজরুলের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো করে চেনাশুনো হয়নি। যদিও বাল্যকালে নজরুলের কবিতাই বেশী করে মনকে টেনেছিল, যে কোন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করতে গেলে নজরুলের কবিতাই প্রথম পছন্দ ছিল। সেই আবেগপ্রবণ বয়েসে নজরুলের রচনাগুলি সোজাসুজি এসে বুকে বেঁধে, অনেক মহৎ ভাবের উদ্দীপনা আসে। মনে হয়, এই কবি সমস্ত মানুষের জয়গান করছেন, যাদের মধ্যে আমিও একজন।

পরে, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে, যখন কবিতা পড়তে শুরু করলাম, শুধু এক ধরনের রহস্য যেমন আনন্দের স্বাদ পাবার জন্য, কোন মহৎ বাণী বা উদ্দীপনার জন্য নয়, তখন আমরা নজরুলের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। সাধারণ ভাবে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের নাম করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একালের পাঠকদের কাছে নজরুলের প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরই প্রায় সমবয়সী। আর একজন কবি, যাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। এমন কি রবীন্দ্রনাথও কবিতায় যেদিকে কখনো যান নি, জীবনানন্দ দাশ আমাদের দিলেন সেই স্বাদ। কবিতায় রহস্যময়তা।

নজরুলের আর একটি দুর্ভাগ্য এই, অনেকের কাছে অবশ্য এটা দুর্ভাগ্য মনে হবে না, কিন্তু আমরা সেইরকমই ভেবেছি। তিনি বহু কবিতা লিখেছেন কিন্তু তার মধ্যে সাধারণ ভাবে লোকে জানে বা পড়ে বা মনে রাখে, আট-দশটি মাত্র। যেগুলি বেশ গরম গরম, কিংবা মহৎ ভাবের উদ্দীপক, যেগুলিতে কবিত্ব খুবই ক্ষীণ। লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গেল নজরুল 'বিদ্রোহী'র কবি, তিনি 'কারার ঐ লৌহকপাট' ভাঙবেন, তিনি 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করার সময় যাত্রীদের হুঁশিয়ার করছেন। এগুলি কৈশোর শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী কিংবা জনসভায় অত্যন্ত কার্যকর কিংবা কবিতার আসরে, যেখানে রসের ভোক্তারা আসেন, সেখানে ম্লান। নজরুল যে বহু সংখ্যক প্রেমের কবিতা লিখেছেন, তার দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হলো না। এমন কি নজরুলের কোন কবিতা যে অশ্লীলতার দায়েও অভিযুক্ত হয়েছিল এ কথা কেউ মনে রাখে না। আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বভাবই এই, বিদ্রোহী যে কোনক্রমেই প্রেমিক হতে পারে না তাদের কাছে। দেশের দুর্দশা নিয়ে যিনি মন্ত্র রচনা করেছেন, তাঁর যেন কোন অধিকার নেই কোন নারীর রূপ-বর্ণনায়। তাঁকে হতে হবে শুধুই আদর্শে গড়া একটি পাথরের মানুষ।

তার ফলে নজরুলের ললাটলিপি হলো এই, তাঁর বেশী সংখ্যক কবিতা, তাঁর প্রেমের কবিতা চলে গেল সবার অগোচরে। তিনি জনগণের কবি হলেন, রাষ্ট্রশাসকরা পর্যন্ত তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন, আমরা, যারা শুধু কবিতা-প্রেমিক, আমরা আস্তে আস্তে দূরে সরে গেলাম। এতে অবশ্য নজরুল বা তাঁর মতন বিখ্যাত কবির কোনই ক্ষতি হবার কথা নয়, কারণ আমরা অত্যন্তই সংখ্যালঘু।

আমরা এখানে উপভোগ করি নজরুলের গান, যার সুরের বৈচিত্র্য মাঝে মাঝে বাংলা গানের একঘেয়েমি থেকে আমাদের কানকে রক্ষা করে। যদিও সেই সব গানের কথা-সম্পদ তেমন ভাবে মন টানে না।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি নজরুল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। দেশে তখনো কোন রাজনৈতিক গণ-চেতনা দানা বেঁধে ওঠে নি। কিন্তু দৃঢ়মুষ্টি ব্রিটিশ রাজদণ্ডের অন্তরালে বাঙালী মনে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত। রবিদীপ্ত সাহিত্যের আকাশ। দিকে দিকে ছন্দ ও সঙ্গীতের মূর্ছনা। তবুও অসন্তোষ এবং পরাধীনতার গ্লানি জাতির অন্তরে। লোকচক্ষু ও ইংরেজ সরকারের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে বিপ্লব প্রয়াস গোপনে আত্মবিস্তার করে চলেছে। মৃত্যুপণ! তবুও প্রতিনিয়ত সন্দিহান পদক্ষেপ। মনের কথা প্রকাশ করাও যেন অপরাধ।

উনিশ-শো চৌদ্দ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, উনিশ-শো আঠারো খৃষ্টাব্দের এগারোই ডিসেম্বর তার অবসান হলো। ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পরেও ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন রাখলেন। বাঙালী পল্টনের যে উনপঞ্চাশৎ বাহিনী রণক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আত্মবিসর্জন করেছিল, তার অবশেষ রিজার্ভ ফোর্স সংরক্ষিত হলো করাচীতে। এই বাহিনীতে ছিলেন নির্ভীক তরুণ সৈনিক কাজী নজরুল—হাবিলদার। ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখা ও আবৃত্তি করার ঝোঁক তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনেক বড় বড় কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। অবসর সময়ে ক্যাম্পে বসে তিনি আবার শুরু করলেন কাব্যচর্চা।

এই সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন একজন ফার্সী-জানা মুন্সী। তাঁর সাহায্যে নজরুল খ্যাতনামা ফার্সী কবিদের বই পড়তে লাগলেন। বিশেষ করে, হাফিজের কবিতাগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। এই সময়ে লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা সওগাত ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় এবং পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উনিশ-শো বিশ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সৈন্যদের তলব মিটিয়ে, করাচীর এই রিজার্ভ ফোর্স ছত্রভঙ্গ করা হলো। সৈনিক জীবনের নির্মম বন্ধন

থেকে মুক্ত হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন বাংলার সাহিত্য-আকাশে ধূমকেতুর মতো। হ্যালে'জ কমেট! কণ্ঠে বিদ্রোহের জেহাদ। দেহমনে তারুণ্যের উদ্দাম গতিবেগ। ধূমকেতুর মতোই অগ্নিময় আস্ফালন।

যুদ্ধ-প্রত্যাগত হাবিলদারকে ইংরেজ সরকার সব-রেজিস্ট্রার অথবা পুলিস সব-ইন্সপেক্টরের পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু নজরুল সে চাকরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর রক্তে তখন যৌবনের উন্মাদনা, চিত্তে বিদ্রোহের ঝড়। ভালো লাগে না গতানুগতিক জীবনধারা।

করাচী থেকে কলকাতায় ফিরে এসে নজরুল উঠলেন কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। সেখানে থাকতেন ডঃ শহিদুল্লাহ, মুজাম্মেল হক ও মুজাফ্ফর আহমদ। দুদিনেই নজরুল তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। সাহিত্যসাধনার নেশায় 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদান ক'রে তিনি সেখানে লিখতে শুরু করলেন। কাগজখানির পরিচালক ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। নজরুল যোগদান করবার পর 'নবযুগ' পত্রিকার প্রচার প্রায় দশগুণ বেড়ে গেল। কবিও ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। এই সময় তাঁর আরও কয়েকটি কবিতা ও গান বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো।

উনিশ-শো একুশ খৃষ্টাব্দে শুরু হলো ভারতের মুক্তিসংগ্রাম —দেশব্যাপী নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন। জনমনের ছাই-চাপা আগুনে লাগলো চৈতালি বাতাস। নজরুল মেতে উঠলেন। যৌবনোচ্ছল বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ। সভা-সমিতি ও মজলিসে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে শোনাতে লাগলেন স্বরচিত গান ও কবিতা। তরুণদের মনে উদ্দীপনার জোয়ার বইতে লাগলো।

নজরুল গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গাইলেন—

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ওই এলো ওই,
এলো ওই মুক্তি যুগান্তর রে।

মুক্তি আন্দোলনের একজন জনপ্রিয় পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়ালেন নজরুল। সারা বাংলায় তাঁর গান প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

কিছুদিন পূর্বেই 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্যথার দান'। তাঁর আবেগপ্রবণ উদ্দাম ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করে।

কলকাতায় এসে অতি অল্পকালের মধ্যেই নজরুল সুপরিচিত হয়ে উঠলেন কবি সাহিত্যিক ও সম্পাদকগোষ্ঠীর অনেকের নিকট। অনেকের সঙ্গেই হলো তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব। এই সব বন্ধুবান্ধবদের আকর্ষণে তিনি বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রের অফিসেও যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। শৈলজানন্দ ছিলেন তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু ও সহপাঠী। সবুজপত্রের পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি হয়েছিল চিঠিপত্রের মাধ্যমে, যখন করাচী থেকে তিনি গান ও কবিতা পাঠাতেন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। কবি যতীন বাগচীর বাড়িতে তাঁর আলাপ হলো হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে। নলিনীকান্ত তখন 'বিজলী'র সম্পাদক। এই সব পরিচিতির সূত্র ধরে নজরুলের গোষ্ঠী বৃহত্তর হয়ে উঠলো। তখন বাংলাদেশের কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল একটা উদার গুণগ্রাহিতা।. গণ্ডীগত হীনমন্যতা ও বিদ্বেষবিষে শিল্পী-মন জর্জরিত হয় নি। তাই পরস্পরকে পাদপ্রদীপে তুলে ধরবার সক্রিয় প্রয়াস তাঁদের সকলেরই ছিল। নজরুলের বেলায়ও তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হলো না।

যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। দেখতে দেখতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারত জেগে উঠলো। বাংলা দেশে বয়ে গেল তার প্রবল জোয়ার। ছাত্ররা ইস্কুল-কলেজ থেকে দলে দলে বেরিয়ে পড়লো রাজপথে। দেশের তরুণেরাও এগিয়ে এলেন। গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন ও বিপিন পাল প্রমুখ নেতাদের উদাত্ত আহ্বানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো হাজার হাজার মানুষ। ছাত্র, শিক্ষক,

শ্রমিক, কৃষক ও মজুর সকলেই যোগ দিলেন এই আন্দোলনে:
'বিলাতি বর্জন কর। স্বদেশী গ্রহণ কর।'—স্বদেশী আন্দোলন।

চারিদিকে সভাসমিতি ও মিছিল। মিছিলে গাওয়া হতো দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের গান। কিছুদিন পরে পথ-পরিক্রমায়. কাজী নজরুল ইসলামের একটি নতুন গান সংযোজিত হলো। তরুণ মনে নতুন উৎসাহের তরঙ্গ নিয়ে এল এই গান:

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল॥

এই সময় 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হলো কবি নজরুল ইসলামের 'কামাল পাশা'। তারপর ১৯২২ খৃঃ জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় ছাপানো হলো সৈনিক কবির যুগান্তকারী কবিতা 'বিদ্রোহী'। এই কবিতার কিয়দংশ ছাপানো হয় 'মোস্‌লেম ভারতে'। সপ্তাহ দুই পরে ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সম্পূর্ণ কবিতাটি সংকলিত হলো। সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম আখ্যাত হলেন বিদ্রোহী কবি ব'লে।

বাংলার সাহিত্যাকাশ আলোড়িত হলো মুক্তিকামী নির্ভীক ব্যক্তিসত্তার এই দুর্জয় আত্মপ্রকাশে। দেশের তরুণমনে লাগলো ঝড়ের দোলা। সুপ্ত ভীরু মনের রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত করলো এই কবিতার প্রতিটি ছত্র:

'বল বীর—
বল উন্নত মম শির!

শির   নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির !

বল বীর—

বল   মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'

চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোকে গোলক ভেদিয়া।

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !....

বল বীর—

চির   উন্নত মম শির।'

আমি ধূর্জটি, আমি ঝঞ্ঝা, আমি মহামারী, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান, বিদ্রোহী ভৃগু। আমি ব্যোমকেশ, পিনাকীর ত্রিশূল, বলরামের হল ইত্যাদি।

'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,

আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ !'

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে বেশ একটা প্রতিক্রিয়াব সঞ্চার হলো। জ্ঞানীগুণী অনেকেই বললেন যে, কবির এই লেখা ইসলাম-বিরোধী। ইসলাম-বিরোধী মানেই কাফের। কবি কাগজে-কলমে কোন প্রতিবাদ করেন নি। তবে যাঁরা অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন, তাঁদের বলেছিলেন—'হাফেজ ও রুমি তো তাহলে আবও বেশী ধর্মদ্রোহী।'

কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩।৪-সি তালতলা লেনের বাড়িতে লেখা হয়। সেখানে তিনি ও মুজফফ্‌র আহ্‌মদ সাহেব থাকতেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, কাজী সাহেব কলকাতায় ফিরবার মাস দুই পরেই কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তিনি মোহিতলালের বাসায় পবিত্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে যেতেন। মোহিতলালও প্রায়ই আসতেন তাঁর আস্তানায়। তখন নজরুলের বয়েস একুশ, আর মোহিতলালের বত্রিশ। মাঝে

মাঝে দুজনের আলাপ-আলোচনা, কবিতা শোনানো ইত্যাদি হতো। নজরুলের কবিতা যখন 'মোসলেম ভারতে' ছাপানো হচ্ছিল, তখন থেকেই মোহিতলাল তাঁর কবিপ্রতিভায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৩২১ সালের (১৯১৪ খৃঃ) পৌষ মাসের 'মানসী'তে মোহিতলালের "আমি" শীর্ষক একটি কাব্যগন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন—'আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর....সর্বব্যাপী। সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন।....আমি ভীষণ....শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি....ব্রাহ্মণের অভিশাপ....রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়-গিরির ধূমাগ্নিমনের মত। আমিই মহামারী।....ইত্যাদি ইত্যাদি।'

লেখাটি মোহিতলাল একদিন নজরুলকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লেখা হয়। মোহিতলালের 'আমি' ভাষা-আলেখ্যটি থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার বিবাট ব্যক্তিপুরুষ সম্পর্কে নজরুলের মনে একটা ইঙ্গিত বা অনুপ্রেরণা (thought suggestion) হয়েছিল বলে মনে হয়। 'বিদ্রোহী' যে নজরুলের একটি বলিষ্ঠ মৌলিক সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিদ্রোহীর রূপ-কল্পনায় মোহিতলালের 'আমি' অনেকখানি আলোক-সম্পাত করেছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

নজরুলের সাহিত্যসাধনায় যাঁদের উৎসাহ সাহচর্য ও প্রযত্ন অনেকখানি সহায়ক হয়েছে, তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মঈনুদ্দিন সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্যজীবনের ইতিহাসে সব চেয়ে স্মরণীয় বৎসর। এই সময় তিনি তালতলা ছেড়ে ৮এ, টার্ণার স্ট্রীটে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন। এই বাড়িতে নিয়মিত ভাবে কবি ও সাহিত্যিকদের সমাগম হতো এবং নজরুলের অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা এখানে রচিত হয়।

এই বৎসর আগস্ট মাসে বিদ্রোহী কবির 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু'কে অভিনন্দিত

করলেন তাঁর আশীর্বাণী দিয়ে। প্রথম প্রকাশ থেকেই ‘ধূমকেতু’ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। চারিদিকে সাড়া পড়লো—‘ধূমকেতু—ধূমকেতু—ধূমকেতু!’

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।....
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
যারা আছে অর্ধচেতন।

কবিগুরুর এই আশীর্বাদে যেন নজরুলের নতুন করে দীক্ষা হলো বীরধর্মে। আর কোন অগ্রণী বা বরেণ্য মনীষী এমন করে তাঁকে উৎসাহিত করেন নি। আপন প্রতিভায় প্রদীপ্ত তরুণ কবির জীবনে শুরু হলো নির্ভীক জয়যাত্রা। মহারথীর মতো একাকী এগিয়ে চললেন প্রবন্ধ, কবিতা ও গানে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলন চরম পর্যায়ে উঠেছে। ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। কঠোর হস্তে আন্দোলন-দমন-প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। অনেক স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হলেন। অনেক বই ও পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা হলো। এই বৎসর প্রকাশিত হলো নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’, ‘যুগবাণী’ ও ‘ব্যথার দান’। ধূমকেতুর উপরেও সরকারের দৃষ্টি পড়লো।

এমন সময় হঠাৎ পূজা সংখ্যার ‘ধূমকেতু’তে ছাপানো হলো নজরুলের সুদীর্ঘ কবিতা “আনন্দময়ীর আগমনে”। অগ্নি উদ্‌গীরণ করলো তরুণ কবির দুর্জয় লেখনী ঃ

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী?

* * *

হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্ত দে মা, রক্ত দেখা !

রাজরোষ প্রজ্জ্বলিত হলো। পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হলো। গ্রেফ্তারি পরোয়ানা বেরুলো সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম এবং প্রকাশক-মুদ্রাকর আফ্জালুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে। পুলিস তছনছ করলো ৬নং প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনের 'ধূমকেতু' অফিস (লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা) ও ৩২নং কলেজ স্ট্রীট—মোসলেম সাহিত্য সমিতির আস্তানা। উভয়েই অভিযুক্ত হলেন রাজদ্রোহিতার অপরাধে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো'র এজলাসে কাজী নজরুল ইসলামের বিচার হলো। রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারক তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। যদিও কবি তাঁর লিখিত জবানবন্দীতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি নিজেকে রাজদ্রোহী মনে করেন না, তিনি ন্যায় ও সত্যের উপাসক। এই জবানবন্দীটি সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সম্পদ। ৭ই জানুয়ারী জেলহাজতে বসে নজরুল এই জবানবন্দী লিখেছিলেন এবং ৮ই জানুয়ারী সেটি কোর্টে দাখিল করা হয়।

মাসতিনেক পরে কয়েকজন রাজবন্দীকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে স্থানান্তরিত করা হলো। কয়েকজনকে পাঠানো হলো বহরমপুর জেলে; বাকী কয়েকজনকে হুগলী জেলে। এই হুগলী জেলের রাজবন্দীদের ভিতর ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

আলিপুর জেলে থাকবার সময় নজরুলের পরিচ্ছদ ও খাদ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ছিল, হুগলী জেলে যাওয়ার পর কয়েকদিনের মধ্যে সেটা বদলে গেল। তাঁকে সাধারণ কয়েদীদের পোশাক দেওয়া হলো। জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ থার্সটন ছিলেন রূঢ় ও দুর্বিনীত প্রকৃতির লোক। কোন অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি চোখ রাঙিয়ে কথা বলতেন: রাজবন্দীদের মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও অবস্থা দেখে নজরুল বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন।

হুগলী জেলে থাকতে নজরুল মুখে-মুখে গান রচনা ক'রে উচ্চৈঃস্বরে গাইতেন। অন্যান্য রাজবন্দীরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন।

জেলপ্রাচীরের বাইরে থেকে সেই সব গান শুনে ছাত্র ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরা গানগুলি বাইরে প্রচার করতে লাগলেন। ফলে জেলসুপার ক্ষেপে উঠলেন। একদিন অভদ্র ভাষায় তিনি রাজবন্দীদের গালাগালি করলেন

নির্ভীক সৈনিকের মতো বুক উঁচিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, সেই সব গালাগালি নজরুল সেই জেলসুপারকে ফেরত দিলেন।

নজরুলকে 'সেলে' রাখবার ব্যবস্থা হলো। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ তাঁর বন্দীজীবনে অপরিসীম শক্তি সঞ্চার করলো।

'সেলে' নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে, যখন রাজবন্দীদের পায়ে বেড়ি দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি গান রচনা করেছিলেন ঃ

এই শিকল পরা ছল,
মোদের এই শিকল্‌ পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

*　　*　　*

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন,
জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটি ধরব টিপে,
করব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা পরে ফাঁসি আনব হাসি,
মৃত্যুজয়ের কল॥

নজরুলকে যখন 'সেলে' আটক করা হলো, অন্যান্য রাজবন্দীরা এই গানটি জোরে জোরে গাইতেন। নজরুল নিবিষ্ট মনে শুনতেন। সেলে বসে তিনি গাইতেন ঃ

ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ও-ভাই মোদের আঁখি ফুটবে।
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে,
ও-ভাই মোদের বাঁধন টুটবে॥

তখন মে মাস। নজরুলের বয়েস সবে চব্বিশ। রাজবন্দীদের প্রতি সরকারের অবহেলা এবং জেল-কর্মকর্তাদের কারাগার সম্পর্কে অব্যবস্থা তাচ্ছিল্য ও অবাঞ্ছিত ব্যবহারের প্রতিকারকল্পে নজরুল অনশন শুরু করলেন।

উপবাসে দিন দিন কবি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করলেন না। বাইরে থেকে নানা রকম চেষ্টা করেও সে অনশন ভঙ্গ করা গেল না।

'সেল' থেকে সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা তাঁকে বাইরের 'লনে' আসতে দেওয়া হতো। সেই সময় অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হতো। তবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেওয়া হতো না। দেহ অনশনক্লিষ্ট হলেও কণ্ঠস্বর তেমনি উদাত্ত ছিল। তিনি জোর গলায় গাইতেন :

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর্‌বে লোপাট,
রক্তজমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক পাষাণ প্রাচীর ভেদি॥

এই সকাল-বিকালের এক ঘণ্টার অবসরে তাঁর সঙ্গে বাইরে থেকে দেখা ক'রে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানাবার জন্য কবির বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার ও পবিত্র গঙ্গোপাধায় প্রায়দিনই গিয়ে দাঁড়াতেন হুগলী ব্রিজের পাশে উঁচু ঘেরের মাথায়। সব দিন দেখা হতো না। দেখা হলেই তাঁরা ইশারায় অনুরোধ জানাতেন অনশন ভঙ্গ করার জন্য। ফল বিশেষ হয় নি।

মাসাবধিকাল অনশনের ফলে কবির স্বাস্থ্য উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়ালো। কবিগুরু এই সংবাদ পেয়ে শিলঙ থেকে টেলিগ্রাম করলেন—'অনশন ত্যাগ কর। আমাদের সাহিত্য তোমায় দাবী করে।'

সরকার পক্ষের গাফিলতির জন্যে কবিগুরুর 'তারবার্তা' নজরুলের হাতে পৌঁছলো না। তবে এ সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছলো। তরুণ কবির মন গর্বে ভরে উঠলো।

কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় জেলকর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা হলো। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সংবাদ পেয়ে কুমিল্লা থেকে গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা এসে নজরুলের সঙ্গে হুগলী জেলে দেখা ক'রে, উপবাস ভঙ্গের জন্য অনুনয় করলেন। তাতেও কোন ফল হলো না। এই পরিবারের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে।

কলকাতার জনসভার পর সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বন্দীদের দাবী মেনে নেওয়া হবে। তখন অনশন উনচল্লিশ দিনে পৌঁচেছে।

চল্লিশ দিনের দিন কুমিল্লার ওই পরিবারের বিরজাসুন্দরী বীরেন সেনগুপ্তের সঙ্গে হুগলী জেলে কবির অনশন ভঙ্গ করলেন।

হুগলী জেল থেকে নজরুলকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। এই সময় কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' নাটক কবি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। বইখানির উৎসর্গপত্রে গুরুদেবের নিকট 'কবি' স্বীকৃতি পেয়ে নজরুল নিজেকে ধন্য ও পরম গৌরবান্বিত মনে করলেন। তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা শতগুণ উজ্জীবিত হয়ে উঠলো।

* * *

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কারামুক্ত হয়ে নজরুল ফিরে এলেন স্বজনসান্নিধ্যে। এপ্রিলের মাঝামাঝি প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো। তিনি পুনরায় হুগলী শহরে গিয়ে সপরিবারে বাসা বাঁধলেন। শাশুড়ী গিরিবালাও তাঁদের সংসারে বাস করতে লাগলেন।

এই সময় 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ হলো। 'কল্লোল'-এ নজরুলের কবিতা ছাপানো হতে লাগলো, কিন্তু তিনি ঠিক গোষ্ঠীভুক্ত হলেন না। 'কল্লোল' দল গঠিত হওয়ার পর থেকেই বাঙলা সাহিত্যে গোষ্ঠী মনোভাবের প্রথম পত্তন হলো। সগোত্রধর্মে

গোষ্ঠীভেদের গণ্ডী ধীরে ধীরে বহুল হয়ে উঠলো। সমকালীন আর একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীপীঠ হলো 'শনিবারের চিঠি'। মোহিতলালের যোগাযোগ হলো 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে।

কার্তিকের কল্লোলে প্রকাশিত হলো নজরুলের সুবৃহৎ কবিতা 'সর্বনাশের ঘণ্টা' (সাবধানী ঘণ্টা)। নজরুল ও মোহিতলালের মধ্যে বিরূপ মনোভাব তখন চরমে উঠেছে। তবুও নজরুল মোহিতলালকে অস্বীকার করেন নি। মোহিতলালের অধিক মুরুব্বিয়ানা তাঁর খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কবিজীবনে মোহিতলালের সহায়তা তিনি ভোলেন নি ও তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করতেও দ্বিধা করেন নি।

হুগলীতে থাকবার সময় নজরুল সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করলেন। ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির সংগঠনে তিনিই হলেন প্রধান পাণ্ডা। এই বৎসরের শেষদিকে তাঁর কবিতার বই "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান" প্রকাশিত হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই বই দুখানি বাংলা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলো।

কলকাতা থেকে কবি-সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই যেতেন নজরুল-দম্পতির আস্তানায়। অর্থের অনটন থাকলেও আনন্দের অভাব ছিল না। বিয়ের বছরখানেক পরে নজরুলের একটি পুত্র হলো। মন খুশিতে ভরে উঠলো। নজরুল সাধ করে নাম রাখলেন—আজাদ কামাল। কিন্তু সে আনন্দে বিধি বাদ সাধলো। কামাল তাঁদের কোল খালি করে চলে গেল।

হুগলী আর ভাল লাগলো না।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নজরুলের হিতৈষী বন্ধু হেমন্ত সরকার (হেমন্তদা) তাঁদের কৃষ্ণনগরে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন নজরুল সপরিবারে হেমন্তবাবুর বাড়িতেই থাকলেন। তারপরে চাঁদ সড়কের ধারে একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করে হেমন্তবাবু তাঁদের সংসার গুছিয়ে দিলেন।

মন কিছুটা স্থির হলো। এই বাড়িতে বসে কবি আবার লিখতে শুরু করলেন। কবিতার পর কবিতা লেখা হলো: 'খালেদ',

'শ্রমিকের গান', 'ধীবরের গান' ও 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার আবার নতুন করে এক অভাবনীয় প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। মুখে মুখে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো তার ঢেউ :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

* * *

দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ!
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

* * *

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান!

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে যে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন হলো, তার উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করলেন নজরুল। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল গঠিত হলো। নজরুল গাইলেন 'শ্রমিকের গান' :

ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় টলে তুষার গলে,
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে।
মোরা সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধার বিন্দু জল।
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল॥

* * *

গানটি 'লাঙ্গল' পত্রিকায় ছাপানো হলো। এই 'লাঙ্গল'ই পরে 'গণবাণী' নামে অভিহিত হয়।

কৃষ্ণনগরে থেকে কবিতা ও গান লেখা চলছিল বটে, কিন্তু অর্থাভাবে সংসার হয়ে পড়লো অচল। তার উপর ধরলো ম্যালেরিয়া। মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর আর্থিক অবস্থা দেখে, তাঁকে 'লাঙ্গল' পত্রিকা পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করলেন। আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটলো। কিন্তু নজরুলের সাংসারিক ব্যয় ছিল খুব বেশী। সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হলো না।

শেষ পর্যন্ত নজরুলকে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো। মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে বাসা করলেন। একে একে প্রায় সবগুলি বই-এরই কপিরাইট বিক্রি করলেন। যে সব বই জনপ্রিয় হয়েছিল, তার সর্বস্বত্ব কবলিত হলো প্রকাশকের। সুতরাং সাহিত্য থেকে নিয়মিত কোন টাকাপয়সা পেলেন না।

আবার সেই অচল অবস্থার উদ্ভব হলো।

এই সময় তাঁর পরম হিতৈষী বন্ধু হলেন কালিকা প্রেস ও টাইপ ফাউণ্ড্রির অন্যতম স্বত্বাধিকারী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। নজরুলের নিত্য প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে তাঁর কাব্যসাধনায় উৎসাহিত করতে লাগলেন। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এবং কাব্যসাধনার প্রেরণাকে উজ্জীবিত করবার জন্য নিজে কবিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দার্জিলিঙ।

মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। নজরুলের জন্য তিনি যা করেছিলেন, তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। তিনি সত্যই ছিলেন গুণের পূজারী ও অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী। নজরুলকে দিয়ে তিনি 'মরুভাস্কর' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়েছিলেন। নজরুল এই বইখানির কপিরাইট মনোরঞ্জনবাবুকে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বইখানির রচনা তিনি সম্পূর্ণ করেন নি। কবি অসুস্থ হওয়ার পর মনোরঞ্জনবাবু এখানির শেষ অংশটুকু লিখে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া পড়ে, আমি সেখানি মনোরঞ্জনবাবুকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। হজরতের জীবনী। আমি তাতে হস্তক্ষেপ করি নি।

মনোরঞ্জনবাবু পরে এই পাণ্ডুলিপি এবং গ্রন্থস্বত্বের স্বাক্ষরিত দলিলখানি কবির ছেলেদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মসজিদবাড়িতে থাকতে নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়। মন আবার ভেঙে পড়লো। নিদারুণ শোকে কবি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। একে এই পুত্রশোক, তার উপর অভাবের তাড়না। ঋণে জর্জরিত হয়ে দিশেহারা হলেন। চারিদিক থেকে পাওনাদারেরা তাগাদা শুরু করলো। নিরুপায় হয়ে নজরুল কলকাতার নামজাদা এটর্নি অসীমকৃষ্ণ দত্তের কাছে চার হাজার টাকা ধার করে পাওনাদারদের ঋণ শোধ করলেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা আগস্ট গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে নজরুল ইসলামের সঙ্গে এক কনট্রাক্ট হলো। শর্ত হলো যে, তিনি তাঁদের গান রচনা ও রেকর্ডিং প্রযোজনা করবেন। প্রতি রেকর্ডের দরুন তিনি শতকরা হারে রয়াল্‌টি পাবেন। কবি নতুন করে জীবনের পথ খুঁজে পেলেন। বিদ্রোহী কবির লেখনীতে উৎসারিত হলো ললিত গীতির মন্দাকিনী ধারা। দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করলেন গান লিখতে। বাংলায় গজলের জোয়ার বয়ে গেল। দেখতে দেখতে গ্রামে নগরে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়লো সেই গজলের ঢেউ।

কে বিদেশী বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
সুর সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম বাগের গুলবদনে।....ইত্যাদি

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল।
এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াসা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে
এ নহে বাদল।

স্তব্ধ দুপুরে রাখাল ছেলে গাছের ডালে বসে গাইতে লাগলো—

বাগিচায় বুলবুলি তুই
ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল।
আজো তার ফুলকলিদের ঘুম টুটে নি
তন্দ্রাতে বিলোল॥

গজল লিখতে লিখতেও যেন মাঝে মাঝে কবির সুর কেমন মন্দীভূত হতো, ভিজে উঠতো অনুভূতি। হঠাৎ একদিন একটা গান লিখে তরুণ সুরশিল্পী বিমলভূষণকে দিলেন :

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি !
ভোরের হাওয়ায়
কান্না পাওয়ায়
তব ম্লান ছবি।

অর্থের চাহিদা অনেকখানি মিটেছে। কাজী নজরুল তখন থাকেন বাহান্ন নম্বর হরি ঘোষ স্ট্রীটে। কবিপত্নী অসুস্থ।

আমার তখন হঠাৎ গান লিখবার ঝোঁক হয়েছিল। অনেকগুলো গান লিখে ফেলেছিলাম। কয়েকটি গান সুরকার ধীরেন দাস নিলেন এইচ এম ভি'তে রেকর্ড করাবেন ব'লে। কয়েকটি গান বিমলভূষণ গাইতে লাগলেন রেডিওতে।

কাজীদার বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম। কিন্তু এবার একদিন ধীরেন দাস নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে।

আমরা গিয়ে কাজীদার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই তিনি স্বভাবসুলভ উচ্ছল হাসির সঙ্গে বলে উঠলেন : 'আরে এসো এসো।'

আমার দিকে চেয়ে বললেন—'তুমি তো বেশ গান লেখো। ধীরেন, কি যেন ওর গানের সেই লাইনগুলো ?'

ধীরেন দাস শোনালেন—

যে কথা হয় নি বলা রাতের শেষে,
বিদায় বেলার ভীরু আবেশে,
করে আনমনা আজি একেলা সাঁঝে,
ঝরে তারি লাগি আঁখি অবিরল।'

কাজীদা বললেন—'বেশ। ধীরেন, তুমি হীরেনকে নিয়ে আর ওর কয়েকটা গান নিয়ে স্টুডিওতে যেও।'

কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর আমরা চলে এলাম।

হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে কাজীদার সঙ্গে কথাবার্তা হলো গান

রেকর্ডিং সম্পর্কে। তাঁর নির্দেশমতো সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেলবেলায় ধীরেন দাসের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর চিৎপুর স্টুডিওতে গেলাম। কাজীদা তখন স্টুডিওতেই ছিলেন। গানগুলি তাঁর হাতে দিলাম।

ঘর ভরতি লোক। কেউ কেউ কাজীদার সামনে, কেউ বা দূরে হারমোনিয়মের সামনে বসে আছেন। দু'একজন মহিলাও ছিলেন। প্রায় সবাই কাজীদাকে 'চীফ্' বলে সম্বোধন করছিলেন।

আমার জন্যে চা-বিস্কুট এলো। কাজীদা তখন অন্য এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। চা নিয়ে দেখলাম—কাজীদার সামনে মস্ত একটা ডিবে ভরতি পান; পাশে জর্দার কৌটো। পানগুলো দেখে লোভ হলো।

ধীরেন দাস একটু তফাতে বসে ছিলেন।

ডিবে থেকে দুটো পান তুলে নিয়ে যেই মুখে দিতে যাবো, ধীরেন দাস এক লাফে আমার কাছে এসে হাত দুটো চেপে ধরলেন: 'না, না। আমি পান আনিয়ে দিচ্ছি।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে কি কাজীদার পান আর কেউ নিতে পারে না! না, অন্য কিছু?

প্রশ্নটা মনেই থেকে গেল। ধীরেনবাবুকেও খোলসা জিজ্ঞেস করতে পারি নি। কেমন একটা সংকোচ হচ্ছিল।

বাংলাদেশের সমাজ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। মুসলমান ধর্মগ্রন্থ ও সেই সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত এবং পৌরাণিক কাহিনীও কিছু কিছু পড়াশুনা করেছিলেন। তার উপর পারসীক কবিদের কাব্যগ্রন্থগুলিও খুব ভাল করে পড়লেন করাচীতে গিয়ে। ফলে তাঁর ধর্মবিশ্বাস অনেকখানি সুফী ভাবাপন্ন হয়েছিল। সেই জন্য অনেক কবিতা ও গানে তিনি হিন্দু দেব-দেবীর রূপ কল্পনা করতে দ্বিধা করেন নি।

পূর্বে একটি গানে লিখেছিলেন—

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।

*　　　*　　　*

নয়টি নালা আছে তাহার··· ইত্যাদি

এটি সুফীবাদের দেহতত্ত্ব। অন্নময় ও প্রাণময় দেহকোষের নবদ্বার পারসীক সুফীদেরই উক্তি। তাঁরাও ধ্যান ও ভাবোন্মাদ (Ecstasy) ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর ললিত গান ও গজল লিখতে লিখতে কবি লিখে বসলেন শ্যামাসঙ্গীত। সেই সঙ্গে রাধা-শ্যামকেও স্বীকার করে নিলেন ভক্তিপ্লুত চিত্তে।

লিখলেন—

বল রে জবা বল,
কোন্ সাধনায় পেলি
শ্যামা মায়ের চরণতল!
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে
মুক্তি পেলি উঠলি ফুটে
আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা,
জীবন হোক সফল॥

আবার লিখলেন—

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম।
মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু,
ঠাকুর হলেন রাধা-শ্যাম॥

গানগুলির ব্যাপক প্রচার হলো। কাজী নজরুলের এই শ্যামা-সঙ্গীতগুলি শুনে লালগোলা স্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদার একদিন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বরদাবাবু ছিলেন একজন সাধক, যোগী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। বরদাবাবুকে অনেকেই চিনতেন। নজরুলও জানতেন তাঁর কথা। আমি যখন বহরমপুর কলেজে পড়ি, তখন অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি খুব ছাত্রবৎসল ছিলেন। তিনি বহরমপুরে এলে কলেজের অনেকেই তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। সত্যি অপূর্ব মানুষ ছিলেন তিনি।

কাজী নজরুলের স্ত্রী অসুস্থ জেনে বরদাবাবু তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে শুরু করলেন। রোগ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস্)। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ ফল হয় নি।

এই সময় বরদাবাবুর সঙ্গে কাজী নজরুলের ঘনিষ্ঠতা ও যোগ সম্পর্কে নানা আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি বরদাবাবুর খুব ভক্ত হয়ে উঠলেন। কবির সঙ্গে জুটলেন কালীপদ গুহ ও আরও দু'একজন বন্ধু।

নজরুল ও কালীপদ গুহ দীক্ষা নিলেন ববদাবাবুর কাছে। তখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ।

শুনেছিলাম বরদাবাবু নাকি নজরুলকে বলেছিলেন যে, দীক্ষা নেওয়ায় আপত্তি নেই তবে যোগসাধনা করবার চেষ্টা না করাই ভালো। যোগের প্রথম সোপান হলো চিত্তশুদ্ধি ও সংযম। সংযম না থাকলে ভয়াবহ বিঘ্ন হতে পারে।

নজরুল নিরস্ত হন নি।

কিছুদিন পরেই নজরুলের মানসিক অস্থিরতা ও কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা দিল। মাঝে মাঝে কেমন পেন্‌সিভ হয়ে যেতেন। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠতো। ভিতরে ভিতরে রোগ বেড়ে চললো। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সেই কালব্যাধি আত্মপ্রকাশ করলো।

বিদ্রোহের কবি, তরুণ বাংলার অন্তরের কবি ধ্যানে মৌন হয়ে গেলেন। গানের অমৃত উৎস হিম হয়ে গেল। তার কারণ কেউ জানলো না। চিকিৎসকেরাও বুঝলেন না।

কবির বন্ধু-বান্ধব স্বজন ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কবি আজও নীরব—ধ্যানমৌন। বাংলার মানুষ তাঁকে ভালবাসতো, আজও ভালবাসে। কিন্তু নির্মম নিয়তি। দেশের ও বিদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হলো না।

১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ খৃঃ ২৫ মে) বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। পিতা কাজী আহমদ ছিলেন কৃষিজীবী স্বল্পবিত্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ।

তারাপীঠের মানসিক ক'রে নজরুলের জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর মা তাঁকে ছেলেবেলায় 'তারাক্ষেপা' বলে ডাকতেন।

গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে নজরুল ইসলাম শিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগেই তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙালী পল্টনে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে গেলেন। কারণ কেউ জানে না। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর প্রকৃতি ছিল বাঁধনহারা। যখন যেদিকে ঝোঁক যেত, সেইদিকেই ঝড়ের মত ছুটে চলতো তাঁর মন ও জীবন। নিজের লাগাম ধরে রাখতে তিনি কোনদিনই পারেন নি।

—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নজরুল ইসলাম

সে বাল্যকালের কথা, তখন আমরা কাশীতে থাকি—জনৈক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য তাহার পুর্বে এই ব্যক্তির নামও শুনি নাই। কিন্তু সে যে কী প্রচণ্ড আলোড়ন—কোন কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে এমন আলোড়ন-উদ্দীপনা-উত্তেজনা

জাগ্রত হয়—তাহা যে না দেখিয়াছে সে ধারণা বা কল্পনাও করিতে পারিবে না। এদেশে তো নহেই—ভারতের অন্য প্রান্তে বা পৃথিবীর অপর কোন দেশেও ঠিক এমন ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। লোকে যেন পাগল হইয়া গিয়াছিল। এমন কি অপর প্রতিষ্ঠিত কবিরাও—সহজাত ঈর্ষা ভুলিয়া—এই কবিতা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইয়াছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কাশীতেই আমরা দেখিয়াছি—সেযুগের এক যশস্বী কবি কিরণচাঁদ দরবেশ গোধুলিয়ার মোড়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়াইয়া আবৃত্তি করিতেছেন, চারিদিকে লোকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে—আর একটা অজানা সাহসে বলিষ্ঠ সঙ্কল্পে মন ভরিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার দোষগুণ লইয়া পরবর্তীকালে অনেক বিচার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এখনও অনেকে অনেক বক্র মন্তব্য করেন—কিন্তু আজ যাঁহারা এই কবিতা বিচার করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই সেদিনকার সে আব্‌হাওয়া জানা নেই। কবিতায় কি ছিল, বক্তব্য কি, অর্থ কি—এসব বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমরা নিরীহ নিরস্ত্র একদল লোক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি—সহায় নাই, সম্বল নাই—নিতান্তই দুরাশা মাত্র আমাদের অবলম্বন। অহরহ মনে মনে হতাশা ও অবিশ্বাসের সহিত লড়িতেছি—সেদিন এমনি একটা আশ্বাসেরই প্রয়োজন ছিল। অস্পষ্ট, অক্রম,—তা হউক, উহার শব্দঝঙ্কারে, উহার গতিতে, উহার তেজস্বিতায় এমন একটা কিছু ছিল—যাহাতে মাছের রক্তও গরম হইয়া ওঠে। এই কবিতা সেদিন বিভিন্ন কাগজে বার বার মুদ্রিত হইয়াছে—প্রতিবারেই সেই কাগজের সেই সংখ্যাগুলি নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সে যুগে ইহাও একটা অঘটন।

* * *

তাহার পর বহুকাল কাটিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া দূর হইতে কবিকে দেখিবারও সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহার মুখে এই কবিতার আবৃত্তিও শুনিয়াছি। কিন্তু তখনও কাছে যাওয়ার সুযোগ মেলে নাই। ক্রমে সে সুযোগও মিলিল একদিন। 'কথাসাহিত্যে'র

বর্তমান সম্পাদক দুইজন তাহাদের পরিণত কৈশোরে একটি ছাপা সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্র প্রকাশ করিয়াছিল; তাহার পরমায়ু খুব বেশী নহে, মাস কয়েকের বেশী টিকে নাই—তবে এইটুকু আমাদের আনন্দ ও গর্বের—অখ্যাত প্রায়-বালক সম্পাদকদের সেই সামান্য কাগজেই তদানীন্তন কালের বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক লিখিয়াছেন। এই 'বিজয়' কাগজের তরফ হইতেই একদিন, বিনা পরিচয়ে, তাঁহার বেনেটোলা লেনের বাসায় গিয়া হানা দিয়াছিলাম—কবি কিন্তু বিমুখ করেন নাই, অপরিচিত অখ্যাত সম্পাদকের দুরাশায় তিরস্কারও করেন নাই—তাহাদের বসাইয়া, তখন-তখনই একটি নূতন গান লিখিয়া দিয়াছিলেন। বহুলোকেব সহিত বহু কথাবার্তার ফাঁকে, এক বিখ্যাত গায়ককে গান শিখাইবাব মধ্যেই জানলায় বসিয়া গুনগুন করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে গানটির রচনা ও সুর সংযোজনা সম্পূর্ণ করিলেন—সে দৃশ্য আজও আমাদের চোখে ভাসিতেছে।

*   *   *

ক্রমে একটু একটু করিয়া পরিচয় হইয়াছে। খুব অন্তরঙ্গতা হইয়াছে এমন কথা বলিব না। তবে একেবারে শুষ্ক সৌজন্যমাত্রে পরিসমাপ্তি ঘটে নাই সে পবিচয়ের, অনেকটা কাছ হইতেই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু যতরার যত রকমেই দেখিয়াছি—কেমন যেন মনে হইয়াছে—লোকটা জীবন্ত ও চলন্ত আগুন। তাঁহার দুর্বার প্রাণ-শক্তি ক্ষীণতনু স্রোতস্বিনী নয়—বন্যার সময়কার ব্রহ্মপুত্রকে স্মরণ করাইত। মনে হইত আগ্নেয়গিরির আপাতসৌম্য চেহারার ভিতর ফুটন্ত লাভার তরল অগ্নি বাহির হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে; এই দেহের আধারে অতখানি প্রাণশক্তি ধরিতেছে না, তাহারই উচ্ছল প্রকাশ ঘটিতেছে তাঁহার কথায়-বার্তায়, রসিকতায়, গানে-গল্পে-কবিতায়—স্বভাবের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তিতে। এ ধরনের মানুষের চরিত্রে দোষগুণ দুইই থাকিবে—নজরুলেরও ছিল। এ ধরনের চরিত্রে দোষ কেহ তত ধরে না। তাঁহার বেলায়ও সে নিয়মের অন্যথা হয় নাই।

*   *   *

ইহার পর একসময় বন্যার বেগও কমিয়াছে। আগ্নেয়গিরির ভূকম্পনও শান্ত হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি প্রকাশ-পথের জন্য চারিদিকে মাথা খুঁড়িয়াছে একদা, সে নিজের আসল পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। প্রচণ্ড কর্মশক্তি মানবকল্যাণ-চিন্তায় নিয়োজিত হইয়াছে, পূর্ণের সাধনায়, পূর্ণত্বের সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন কবি। কিন্তু যাঁহার জীবনে সবই বিচিত্র, স্বতন্ত্র, সৃষ্টিছাড়া—তাঁহার সাধনাও নির্বিঘ্নে বুঝি সম্পন্ন হওয়ার নয়—তাই সিদ্ধিলাভ হওয়ার পূর্বেই অকস্মাৎ সেই উচ্ছল তরঙ্গধারা স্তব্ধ হইয়া গেল, নির্ঝরিণীর গতিবেগ হইল রুদ্ধ। যাঁহার কণ্ঠ সর্বদা সুরে গুঞ্জরিত হইত, তাঁহার কণ্ঠ একেবারে মৌন হইল। কে জানে এও তাঁহার সাধনা কিনা। কে জানে সর্বশক্তিমানের তাঁহাকে লইয়া ইহাও এক ধরনের লীলা কিনা, কোন্ রহস্যময় পথে এই শক্তি চালিত করিবার এ আয়োজন ভগবানের! কে জানে আরও কি বিস্ময় অপেক্ষা করিয়া আছে কবির অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুগণের জন্য। হয়ত একদা আবার নূতনতর ছন্দে কলম নাচিয়া উঠিবে তাঁহার, নবতর সুরে গুঞ্জরিয়া উঠিবে কণ্ঠ। অন্তত সেই আশাই রাখিব আমরা।

* * *

সেই আশাতেই আমাদের এই প্রীতি ও অনুরাগের ডালি সাজানো, সেই আশাতেই প্রণাম ও নিবেদনের এই আয়োজন। সেই আশার অতীত আশা মনে রাখিয়াই কবির অগণিত গুণীজ্ঞানী বন্ধু-অনুরাগী-ভক্তদের এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের সহিত আমাদের প্রণাম ও প্রীতি যুক্ত করা হইল।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ

* কথাসাহিত্য ১৩৭৭ সালে জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল্ ইসলাম সংবর্ধনা সংখ্যার সম্পাদকীয়।

নজরুল নেই।

"কল্লোল-যুগে" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন—আমি নাকি ছিলাম "নজরুলের পার্শ্বাস্থি"। পরলোকে চলে গেল নজরুল। ইহলোকে সে রেখে গেল তার বহুদিনের পুরাতন অস্থিপঞ্জর।

দীর্ঘায়ু হবার এই এক বিধিদত্ত বিড়ম্বনা: দেখতে দেখতে চোখের উপর দিয়ে আপনজনেরা চিরবিদায় নিয়ে চলে যায়, রেখে যায় চিরবিচ্ছেদের অপূরণীয় অভাব। অভাবই তো দুঃখের জনক। দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ সইতে হয়। সইতে সইতে মনটা ক্রমে ঘাতসহ হয়ে ওঠে। এই তো কিছুদিন আগে দরদী বন্ধু পরিমল গোস্বামী চ'লে গেলেন। সেটা সয়েছে। এটাও সয়ে যাবে।

নজরুলকে আমি প্রথম দেখি ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে ৪এ মোহনলাল স্ট্রীটে আমাদের সাপ্তাহিক পত্র "বিজলী" আপিসে। "বিজলী"র প্রথম সংখ্যা বেরোবার পরই সে এসেছিল আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, প্রাণোচ্ছল যুবা। প্রশস্ত বক্ষ, আয়ত চক্ষু, উন্নত ললাট। স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চ হাসির দর্পণের ভিতর দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে তার অমলিন অন্তঃপুরুষ। মাত্র তার দু-একটি কবিতা আমরা পড়েছি। সেদিন সে কয়েকটি গানও শোনাল আমাদের। রূপ ও গুণের সুন্দর সমন্বয়। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতই দুটি সহজাত সঞ্চয়-সম্পদ নজরুল ইসলামের।

সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। অপরকে আকর্ষণ করবার শক্তি তার যেমন ছিল অসাধারণ, তেমনি নরনারী-নির্বিশেষে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হবার দুর্বলতাও ছিল তার অতি সাধারণ। হয়তো এই দুর্বলতার জন্য সেও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে। নিবিড়

বন্ধুত্ব। পণ্ডিতরা বন্ধুর একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন—"অত্যাগসহনো বন্ধু"। যাকে ছেড়ে থাকা অসহনীয়, তাকেই বলে বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব হল আমাদের দুজনের মধ্যে।

নজরুল কলকাতায় এসেছিল ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে। সে ছিল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে সংগঠিত বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট বা বাঙালী পল্টনের নির্বাচিত সৈনিক। উত্তরসীমান্ত প্রদেশের নৌশেরায় বাঙালী পল্টনের শিক্ষাশিবির। প্রধান কার্যালয় করাচিতে। সৈনিক-বিভাগে সে হাবিলদার-পদে উন্নীত হয়েছিল। তাকে আর যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয় নি। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাঙালী পল্টনও লোপ পেয়ে গেল। একদল বাঙালীকে সশস্ত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ রাখা ইংরেজ সরকার নিরাপদ মনে করল না। নজরুল এল কলকাতায়। তখন তার পরিচয়—হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম। বয়স একুশ বৎসর।

কে এই হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম? এই ১৯২০ সালেই কয়েকটি মাসিক পত্রে তার কবিতা বেরনো মাত্র কলকাতার বিদগ্ধসমাজে জিজ্ঞাসা জেগে উঠল। যতগুলো কাগজে এই সব কবিতা একের পর এক বেরিয়ে চলেছে, তার মধ্যে "মোসলেম ভারত" অন্যতম। সন্ধান পাওয়া গেল—৩১ নং কলেজ স্ট্রীটের এই "মোসলেম ভারত" কার্যালয় সংলগ্ন একটি কক্ষে হাবিলদার কবি বাস করেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়েকজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে "মোসলেম ভারত" কার্যালয়ে গিয়ে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলেন। এঁদের মধ্যে নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হল কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে।

তখন উত্তর কলকাতায় সাহিত্যিকদের দুটি বড় আড্ডা ছিল—একটি ছিল সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমানে কৈলাস বসু স্ট্রীট) "ভারতী" মাসিক পত্রের কার্যালয়ে, অপরটি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে। যথাক্রমে দুটি আড্ডা "ভারতী"র আড্ডা আর গজেনদার আড্ডা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দুটি আড্ডাতেই যেত নজরুল।

দুটি আড্ডাতেই তখনকার কালের খ্যাতিমান সাহিত্যিকেরা সমবেত হতেন। এ ছাড়া আসতেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও মঞ্চশিল্পীরা। আসতেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি নরেন্দ্র দেব, কবি গিরিজাকুমার বসু, কবি মোহিতলাল মজুমদার, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী চারু রায়, সাংবাদিক সুধীরচন্দ্র সরকার, সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার সরকার, মঞ্চশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সুরসিক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত [দাদাঠাকুর], চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও আরও অনেক সুধীজনেরা।

দুটি আড্ডাতেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের গান গাইত। বোধ হয় করাচির সেনানিবাসে বসে সে স্বরলিপির সাহায্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আয়ত্ত করে থাকবে। তখন নজরুলের স্বরচিত গান বেশি ছিল না।

॥ ২ ॥

গান ও কবিতার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেতে লাগল সারা দেশে। ১৯২১-এর বোধ হয় এপ্রিল মাস। তার একজন বন্ধু আলি আকবর খান তাঁর পল্লীগ্রামের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। আলি আকবরের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামে। নজরুল রাজী হল। দুজনে কুমিল্লায় পৌঁছলে আলি আকবর খান নজরুলকে নিয়ে উঠলেন কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবার আলি আকবরের পূর্বপরিচিত। নজরুলের কবিখ্যাতি সে সময় কুমিল্লায়ও প্রসারিত হয়েছিল। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারবর্গ নজরুলকে সাদরে প্রত্যুদ্গমন করে নিলেন। আদরে, আপ্যায়নে কৃতার্থ হয়ে কয়েকদিন পরে নজরুল আলি আকবর

খানের সঙ্গে গেল কুমিল্লা থেকে দশ-বারো মাইল দূরবর্তী দৌলতপুর গ্রামে। এই দৌলতপুর গ্রামে নজরুলের জীবনে যেন একটি নাটক অভিনীত হয়ে গেল: মিলনান্ত নাটকের যবনিকা-পতন হল বিয়োগান্ত দৃশ্যের ভিতর দিয়ে! নাটকের পরিচালক স্বয়ং আলি আকবর খান। ঐ গ্রামেই আলি আকবরের একটি অবিবাহিতা তরুণী আত্মীয়া ছিল। নিকট-আত্মীয়া। দু-চারদিন যাতায়াত ও আলাপ-পরিচয়ের ফলে নজরুলের অনুরাগিণী হয়ে পড়ল তরুণীটি—বলা বাহুল্য অন্তরের অনুরাগে তরুণীটিকে অনুরঞ্জিত করতে নজরুলেরও কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। অন্তরাল থেকে আলি আকবর পাড়ে বসে ছিপখানি ধরে ফাৎনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। একদিন সময় ও সুযোগ বুঝে আলি আকবর তাঁর এই আত্মীয়ার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে বসলেন নজরুলের কাছে। নজরুল নির্বাক এবং অবাকও। সে অনেক প্রেম করেছে কিন্তু কখনও প্রেমে পড়েনি। বাঁধন-ছেঁড়া নজরুল কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হতে নারাজ। বুদ্ধিমান নজরুল বুঝতে পারল, এই জন্যেই তাকে দৌলতপুরে নিয়ে আসা। এ যেন একটা পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত। কিন্তু এই চক্রান্তের চক্রব্যূহ থেকে বেরনো তখন তার পক্ষে সম্ভব হল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহে সম্মতি দিল নজরুল। বিবাহের দিন স্থির হল। ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র গেল আত্মীয়স্বজনদের কাছে। নজরুলের কলকাতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও নিমন্ত্রণপত্র পেলেন। আমার পরম সৌভাগ্য—আমি সে সময় কয়েক মাস পণ্ডিচেরিতে ছিলাম। কলকাতায় থাকলে আমিও হয়তো একখানা নিমন্ত্রণপত্র পেতাম।

বিবাহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হতে চলল। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে দৌলতপুরে এসেছেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়েই কতকগুলি অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে নজরুলের সঙ্গে আলি আকবরদের বাগ্‌বিতণ্ডা বেধে গেল। এতে নজরুলের মন আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও এই বিতর্কে যোগ দিলেন। এই গণ্ডগোলের মধ্যে কোনও এক সুযোগে

নজরুলের অন্তর্ধান। সেই রাত্রে দশ-বারো মাইল পথ হেঁটে নজরুল কুমিল্লায় এসে পৌঁছল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্র বীরেন সেনগুপ্ত।

অসম্পূর্ণ বিবাহ। তবু যে কটি অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়েছিল, তাইতেই এ বিবাহ আইনসিদ্ধ কি না—এ প্রশ্নও উঠেছিল। কিন্তু আইনসিদ্ধ হোক বা না হোক তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ মুসলমান স্বামী কেবলমাত্র মুখের কথায় বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। তার জন্যে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় না। এ বিবাহে নজরুলের বিতৃষ্ণ হবার নাকি আরও কোন অপ্রকাশ্য কারণ ছিল।

॥ ৩ ॥

১৯২২ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই নজরুলের "বিদ্রোহী," আর এই বছরেই নজরুলের "ধূমকেতু"।

"বিদ্রোহী" প্রথমে বেরিয়েছিল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (২২শে পৌষ ১৩২৮) "বিজলী"তে। তারপর বেরোয় "মোসলেম ভারতে"। কবিতাটি "মোসলেম ভারতে"ই প্রথমে বেরোবার কথা। আমি একটি কূট কৌশল অবলম্বন করে প্রথমেই "বিজলী"তে প্রকাশ করেছিলাম। আমি তখন "বিজলী"র সম্পাদকীয় দপ্তরে। "বিজলী"তে "বিদ্রোহী" বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের যুবসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠল, যেন সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠল তাদের মধ্যে। উদীয়মান কবি কাজি নজরুল ইসলাম যেন মধ্যগগনে প্রভাস্বর হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু সমাদরের সঙ্গে সঙ্গে আদর করবার লোকেরও অভাব হল না। কয়েকজন বিরুদ্ধবাদী সাহিত্য-সমালোচক লেখনী ধারণ করলেন নজরুলের বিপক্ষে। যে-মোহিতলালকে নজরুল গুরুর মত শ্রদ্ধা করত আর মোহিতলাল যে-নজরুলকে শিষ্যতুল্য স্নেহ করতেন, সেই কবি মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে

উঠলেন। এর একটা কারণও ছিল। ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা 'মানসী' মাসিকপত্রে "আমি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। নিজের রচনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাঁচজনকে পড়ে শুনিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা মোহিতলাল-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই 'আমি' প্রবন্ধটি হয়তো তিনি কোনদিন নজরুলকে শুনিয়ে থাকবেন। সেই প্রবন্ধটি শোনার ফলেই নজরুলের "বিদ্রোহী"র জন্ম। কথাটা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে দুটি রচনাই আলাদা জাতের। মোহিতলালের প্রবন্ধটি মূলতঃ আধ্যাত্মিক। নজরুলের কবিতা বৈপ্লবিক। মোহিতলালের কবিতা বলে—"আমি স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মা।" নজরুলের "বিদ্রোহী" বলে—"আমি স্রষ্টাসূদন, খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।" কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, মোহিতলাসের একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল। তাঁর 'মানসী'-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ "আমি"র খবর কেউ রাখে না, আর তা থেকে অনু-প্রাণিত হয়ে নজরুল যে "বিদ্রোহী" কবিতা লিখল, তার প্রভাবে সারা দেশ প্রশংসামুখর হয়ে উঠল—এর জন্য মোহিতলাল হয়তো চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মোহিতলাল যে-কথা সুধী সমাজে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন, তা নজরুলের পক্ষে নিতান্ত অব-মাননাকর। মোহিতলাল রটাতে লাগলেন—নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা তাঁর "আমি" প্রবন্ধ থেকে চুরি। স্বভাবতঃই নজরুলের মনও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এমন সময় ১৯২৪, ৪ঠা অক্টোবরের 'শনিবারের চিঠিতে' "বিদ্রোহী"র একটি প্যারডি বেরোলো—"ব্যাঙ্"। নজরুল ভাবল মোহিতলাল ছদ্মনামে এই প্যারডি কবিতা লিখেছেন। চরম উত্তেজিত হয়ে নজরুল উচ্চনিনাদে বাজালো "সর্বনাশের ঘণ্টা" (কল্লোল, কার্তিক ১৩৩১)। "সর্বনাশের ঘণ্টা" কবিতায় মোহিত-লালকে গুরু বলে সম্বোধন করেও কঠোর ভাষায় আক্রমণ করল। "সর্বনাশের ঘণ্টা" পড়ে মোহিতলালও কম উত্তেজিত হননি। তিনি তার জবাবে ১৩৩১ সালের ৮ই কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে লিখলেন এক দুর্ধর্ষ কবিতা—"দ্রোণগুরু"। এই কবিতায় মোহিতলাল

নিজে দ্রোণাচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কর্ণের ভূমিকায় নজরুলকে নামিয়ে যথেচ্ছাভাবে গালাগালি দিতে কুণ্ঠিত হননি। 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিটি সংখ্যা তখন নজরুলের প্রতি কটূক্তিতে মুখর হয়ে থাকত।

এর পরেই "ধূমকেতু"র অভ্যুদয় ১৯২২-এর ১২ই আগস্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী শিরোধার্য করে :

"আয় চ'লে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

অর্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'ধূমকেতু'। বেপরোয়া নজরুলের বেআইনী লেখার জন্যে 'ধূমকেতু'র উপর পুলিসের দৃষ্টি পড়তে বড় বেশি বিলম্ব হল না। সে লুব্ধ দৃষ্টি সার্থক হল ২৬শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতাটির আস্বাদনে। ১৯২২-এর ৮ই নভেম্বরে সদলবলে পুলিসের আগমন ৭নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে 'ধূমকেতু' কার্যালয়ে। সঙ্গে নজরুলকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট। খানাতল্লাস করে পুলিস ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধূমকেতু'র সব-গুলি কপি নিয়ে গেল। পেলে না শুধু নজরুলকে। নজরুল নিরুদ্দেশ। কিন্তু পুলিসের দৃষ্টি বাজপক্ষীর দৃষ্টি। কলকাতার নজরুলকে পুলিস গ্রেপ্তার করল কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ি থেকে। কলকাতায় নজরুলকে নিয়ে এসে সরকার পক্ষ মামলা দায়ের করলে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর এজলাসে। মামলায় নজরুলের "রাজবন্দীর জবানবন্দী" তার অবিস্মরণীয় কীর্তি হয়ে আছে।

১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো নজরুলকে এক বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কিছুদিন রাখার পর নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হল হুগলি জেলে। হুগলি জেলে নানারকম অসুবিধার জন্য প্রতিবাদ করলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্যাতন করতে থাকে জেলের কর্মচারীরা। উপায়ান্তর না দেখে নজরুল অনশন ধর্মঘট অবলম্বন করে। অনশন-ভঙ্গের জন্যে অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন নজরুলকে। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতার বাইরে। তিনি টেলিগ্রাফ করে নজরুলকে অনশন ত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন— "Give up hunger-strike, our literature claims you." দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রামটি নজরুলের কাছে পৌঁছয়নি। আমি একটা দুঃসাহসিক পন্থায় তাকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ করেছিলাম। তখন তার অনশনের আটাশ দিন। আমার অনুরোধ সে করজোড়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ আমার "শ্রদ্ধাস্পদেষু" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অবশেষে কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী হুগলি জেলে এসে নজরুলকে অনশন ত্যাগ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন অনশনের চল্লিশ দিন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল মায়ের মত ভক্তি করত। এই হুগলি জেলে যখন নজরুল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে।

এর পর নজরুলকে পাঠানো হল বহরমপুর জেলে। এখানে অতি সহজেই আইনসম্মত উপায়ে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ আমার "শ্রদ্ধাস্পদেষু"তে আছে। তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কারাজীবন থেকে মুক্ত পেল নজরুল। দিনকয়েক বহরমপুরে থেকে সে ফিরে এল কলকাতায়।

॥ ৪ ॥

যেমন বিচিত্র নজরুল, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ তার জীবন। কারামুক্ত হয়ে আসার পর তার চাহিদা আরো বেড়ে গেল।

মেদিনীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখার বার্ষিক অধিবেশন ১৯২৪-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের সাহিত্য পরিষদের সদস্যরা কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অক্লান্তকর্মী সাহিত্যসেবী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কেও সংবর্ধিত করার আয়োজন করেছিলেন। কলকাতার বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা। অনেকেই গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। নজরুলও গিয়েছিল। নজরুলকে দেখে মেদিনীপুরের অধিবাসীরা মেতে উঠল। তারা নজরুলকেও সংবর্ধনা দেবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠল। প্রথম দিনে সাহিত্য পরিষদ শাখার অধিবেশনাদির পর দ্বিতীয় দিন সকালবেলার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংবর্ধনা সভাতেই ঘোষণা করা হল—অপরাহ্নে কবি নজরুল ইসলামকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে এইখানে। সভাস্থল মেদিনীপুরের কলেজ প্রাঙ্গণ.। তার সংবর্ধনা সভায় নজরুল একাধিক স্বরচিত সঙ্গীত গাইলে, "বিদ্রোহী" আবৃত্তি করলে, একটি সুন্দর ভাষণও দিলে। সেই দিনই আমরা সকলেই কলকাতায় ফিরলাম কিন্তু নজরুল স্থানীয় মহিলাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি দিনের জন্যে থেকে যেতে বাধ্য হল। মহিলারাও তাকে সংবর্ধিত করবেন। মহিলাদের অনুরোধ নজরুল এড়াতে পারল না।

কলকাতায় আমরা মহিলাদের এই সভার বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেদিনও বিকেলে সভার অধিবেশন হয়েছে। যথারীতি নজরুলকে সংবর্ধিত করাও হয়েছে। নজরুল মনের আনন্দে মহা উৎসাহে কবিতা আবৃত্তি করছে। গানের পর গান গেয়ে চলেছে, এমন সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকে একটি মেয়ে মঞ্চের

ওপরে উঠে তার গলার সোনার হার খুলে নজরুলের গলায় পরিয়ে দিলে। হৈ হৈ ব্যাপার! এর পরিণতি বড়ই মর্মান্তিক। মেয়েটির অভিভাবকদের কাছে এটা অমার্জনীয় অপরাধ। একজন মুসলমানের গলায় হিন্দু মেয়ে মাল্যদান করলে! কেবল গঞ্জনাই নয়, তার অভিভাবকদের কাছ থেকে মেয়েটিকে নাকি যথেষ্ট লাঞ্ছনাও পেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে নাইট্রিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করে সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অবসান ঘটালে! সংবর্ধনা-সম্মানিত নজরুল কলকাতায় ফিরল মর্মাহত হয়ে।

॥ ৫ ॥

একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে ভুলেছি।

১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের কিছুকাল পরেই নজরুল কাউকে কিছু না বলে কয়ে একদিন কলকাতা থেকে উধাও হল। মাসের পর মাস কেটে যায়, নজরুলের খবর নেই। খবর পেলাম একজনের কাছে—নজরুল কুমিল্লায়। দৌলতপুর যাবার সময় কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারবর্গের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সেখানে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তখন বৌবাজার স্ট্রীটে 'বিজলী' অফিস। তেতলা বাড়ি। একতলায় ছাপাখানা। দোতলায় অফিস। তেতলায় আমরা থাকি। আমাদের সঙ্গে থাকেন আমাদের দিদি—শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আছি। হঠাৎ কানে এল নজরুলের কণ্ঠস্বর। রাস্তার উপর থেকে সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে দেখি—সদর দরজার সামনে নজরুল দাঁড়িয়ে। রাস্তায় দাঁড়ানো একটা ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে, মনে হল, দুজন মহিলা। নজরুল একটু নিম্নস্বরে আমাকে বলল—"এঁরা কুমিল্লা থেকে আমার সঙ্গে এসেছেন, দু-চারদিন কলকাতায়

থেকে, সমস্তিপুর যাবেন। তোমাদের এখানে এঁদের এই কয়দিন থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পার?"

নজরুলকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি তেতলায় উঠে গিয়ে দিদিকে সব বললাম। দিদি বললেন—"ছু-চার দিন তো? নিয়ে এস।"

নজরুল তাঁদের নিয়ে উপরে উঠে এল। দিদি সাদরে তাঁদের গ্রহণ করলেন। তাঁর নিজের ঘরেই তাঁদের তুজনের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁরা মা ও মেয়ে। মা বিধবা প্রৌঢ়া, মেয়েটি কুমারী চতুর্দশী।

রইলেন তাঁরা আমাদের বাড়িতে। নজরুল গেল তার ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের বাসস্থানে। যে কদিন তাঁরা আমাদের বাড়িতে ছিলেন, নজরুল প্রত্যহ তু-তিন বার এসে তাঁদের খোঁজখবর নিয়ে যেত। নজরুলকে এঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল— "আমার কুমিল্লার মাসীমা আর তাঁর মেয়ে।"

মেয়েকে তাঁর মা "তুলি" বলে ডাকতেন। তাঁরা চার-পাঁচ দিন আমাদের বাড়িতে থেকে নজরুলের সঙ্গে সমস্তিপুর চলে গেলেন।

একটু আগেভাগে বললে ক্ষতি কি?—পরবর্তী কালে এঁরাই নজরুলের শ্বশ্রমাতা গিরিবালা দেবী ও বধূ প্রমীলা।

১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কারাবন্ধন থেকে নজরুলের মুক্তি আর ১৯২৪-এর ২৪শে এপ্রিল তারিখে প্রমীলার সঙ্গে তার বিবাহবন্ধন।

একমাত্র কন্যার মাতা গিরিবালা দেবী ছাড়া কন্যাপক্ষের অন্যান্য আত্মীয়দের সকলেরই অমত ছিল এ বিবাহে। কন্যার খুড়তুতো ভাই অর্থাৎ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্র বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত তখন কলকাতাতেই ছিলেন। তিনি নানাভাবে যথাশক্তি চেষ্টা করেছিলেন এ বিবাহে বাধা দেবার। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল বিবাহের পূর্বে কন্যার ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে। হিন্দু কন্যাকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে, তার হিন্দু নাম পর্যন্ত পালটিয়ে তারপর মুসলমান মতে বিবাহ অনুষ্ঠান। কন্যার ও

কন্যার মাতার মনের খবর নজরুল ভাল করেই জানত। আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মের উপরেও তার বিশেষ আস্থা নেই। সে নিজেই বেঁকে বসে বললে—"না, মুসলমান ধর্মে মেয়েকে দীক্ষিত করা চলবে না।" তখন সিভিল ম্যারেজের তিন আইনের (Act 3) কথা বললেন একজন। এই আইনের একটি বিশেষ শর্ত--বরকন্যা দুজনকেই বলতে হয়, আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান—কোনও ধর্মেরই অনুসারী নই। এতেও নজরুলের আপত্তি। শেষ পর্যন্ত মুসলমান স্মৃতিশাস্ত্র থেকেই একটি বিধান পাওয়া গেল যে, বর ও কনে যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়, তাহলে তারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এই বিধিমতে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হল নজরুল ও প্রমীলার। প্রমীলার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন হল না।

॥ ৬ ॥

নজরুলের চারটি ছেলে। প্রথম ছেলেটি জন্মেছিল হুগলিতে। ১৩৩১ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে জন্মেছিল বলে নজরুল তার নাম দিয়েছিল কৃষ্ণমহম্মদ। ছেলেটি মাত্র তিন-চার মাস বেঁচেছিল। দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম (বুলবুল) ১৯২৬ সালের ৯ই অক্টোবর কৃষ্ণনগরে জন্মায়। সব্যসাচীর (সানি) জন্ম কলকাতায়—৮।১ পানবাগান লেনে। অনিরুদ্ধ (নিনি) আমার ১৫নং জেলিয়াটোলা স্ট্রীটের (বর্তমানে সুধীর চ্যাটার্জি স্ট্রীট) বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়।

হুগলিতে প্রথম পুত্রের জন্মের কয়েকদিন পরে মুসলিম-সমাজ-বিধি-সম্মত একটি অনুষ্ঠান করেছিল নজরুল। কলকাতা থেকে আমরা কয়েকজন বন্ধু সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। বুলবুলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কৃষ্ণনগরেও গিয়েছিলাম আমরা।

হুগলি ও কৃষ্ণনগর থেকে নজরুল মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতো। এলে আমার সঙ্গেও দেখা ক'রে যেতো।

ঘনিষ্ঠতার ফলে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব যেন পারিবারিক আত্মীয়তায়

পরিণত হল। আমার সঙ্গে যেমন নজরুলের বন্ধুত্ব, আমার স্ত্রীর সঙ্গে নজরুলের স্ত্রীর সম্পর্কও তেমনি সখিত্বে পর্যবসিত হল।

নজরুলের কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বাইরে থেকে কলকাতায় এলে সে অসঙ্কোচে আমাকে অনুরোধ করেছে আমার বাড়িতে রাখার জন্যে। একবার তার এক বন্ধু সস্ত্রীক এসে আমার বাড়িতে কয়েকদিন রইলেন। নজরুলের এক বড় ভাই (বৈমাত্রেয়) কিসের যেন লাইসেন্স সংগ্রহ করতে এসে মাসখানেক আমার বাড়িতে ছিলেন।

নজরুল প্রায়ই একটি মেয়ের কথা বলতো আমার কাছে। ছেলেমানুষ মেয়ে কিন্তু এই অল্প বয়সেই নাকি অপূর্ব গান গায়। মেয়েটির নাম রাণু। একদিন সে আমাদের রাণুর গান শোনাবে।

বড় বেশি অপেক্ষা করতে হল না। একদিন সন্ধ্যায় সে রাণুকে নিয়ে হাজির। সঙ্গে আরো দু'জন—রাণুর মা ও মামা। রাণুর গান শোনবার জন্যে আমরা সকলেই উৎকর্ণ। সেই দিনই গানের আসর বসলো আমার বাড়ির ছাদে। ঐটুকু মেয়ে কী অপূর্ব গানই গাইল! ভারি সুমিষ্ট কণ্ঠ—কোকিলকণ্ঠী বললেও অত্যুক্তি হয় না। সকলেই মুগ্ধ। রাণুদের সেদিন তো আমার বাড়ি থেকে যাওয়া সম্ভব হলই না আরও তিন-চার দিন গান শোনাবার জন্যে থাকতে হল। এ কয়দিন নজরুলও রইলো আমার বাড়িতে। এই রাণু পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্যা লেখিকা এবং স্বনামধন্য লেখক বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিণী প্রতিভা বসু।

১৯২৮ সালের শেষাশেষি একজন আমার বাড়িতে এসে খবর দিলে—কৃষ্ণনগরে নজরুলের পরিবারবর্গ খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। দু'তিন মাস নজরুল কৃষ্ণনগরে অনুপস্থিত। সম্ভবত সে ঢাকায়। সব শুনে আমার স্ত্রী বিচলিত হয়ে কৃষ্ণনগরে যাবার জন্যে জিদ্ ধরলেন। পরের দিনই আমরা কৃষ্ণনগর রওনা হলাম। কৃষ্ণনগরে

পৌঁছে দেখি—গৃহস্বামী ফিরেছেন। আমাদের দেখে সে অবাক্ হলো, খুশীও হল। আমার স্ত্রী অন্তরালে নজরুলের শাশুড়ী ও স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত করলেন যে, কৃষ্ণনগরে থাকা সমীচীন নয়। নজরুলকেও রাজী হ'তে হল। কৃষ্ণনগরের পাঠ চুকিয়ে সপরিবার নজরুল আমাদের সঙ্গে কলকাতায় এসে আমার বাড়িতেই উঠলো। মাসখানেক আমার বাড়িতে থেকে তারা গেল ওয়েলেসলি স্ট্রীটে "সওগাত" অফিসের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর শ্রীমান শান্তিপদ সিংহ তাদের নিয়ে গেল ৮।১ পান-বাগান লেনে। এই বাড়ির দোতলায় নজরুল। একতলায় শান্তিপদ সিংহ। এই শান্তিপদ সিংহ ছিল 'ধূমকেতু'র ম্যানেজার, তার সঙ্গে আমারও ছিল স্নেহের সম্পর্ক। এই বাড়িতেই সব্যসাচীর জন্ম।

॥ ৭ ॥

হিজ মাস্টারস ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে নজরুলের প্রথম যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেক নজরুলজীবনচরিতকার অনেক রকম কথা বলেছেন। আমার কথাটাও বলি:

নজরুল গানের পর গান লিখে চলেছে। সে-সব গান নানা সভায়, নানা আসরে সে নিজে গাইছে, গাইছেন আরও কয়েকজন গায়ক। গাইছেন সুকণ্ঠ গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য, গাইছেন তখনকার দিনের সর্বাধিক জনপ্রিয় গায়ক দিলীপকুমার রায়। সব গানের সুর-রচয়িতাও নজরুল। ক্রমে ক্রমে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে নজরুলের গানে।

আমি তখন গ্রামোফোন কোম্পানির আর্টিস্ট। আপার চিৎপুর রোডের লক্ষ্মী হাউসে সে-সময় গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সালের ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে আমাকে সেখানে যেতে হয়। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানির ভারতীয় সঙ্গীতের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য মশায় আমাকে বললেন: "শুনেছি কাজি

নজরুল ইসলাম আপনার বন্ধু। একদিন তাঁকে এখানে আনতে পারেন ?"

নজরুলকে সাধাসাধি করতে হল না। সহজেই রাজী হয়ে গেল সে। আমি তাকে লক্ষ্মী হাউসে নিয়ে গেলাম। ভগবতী ভট্টাচার্য নজরুলকে বেশ কতকগুলি শ্রুতিমধুর কথা ব'লে আলাপাদির পর গান শোনাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। গানের আসর বসলো। অনেকগুলি গান গাইলো নজরুল। সেইখানেই কথা হল নজরুলের গানের রেকর্ড করা প্রসঙ্গে। সম্মানদক্ষিণার জন্যে সিদ্ধান্ত হল—পরদিন সকালবেলায় এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হবে। নজরুল পানবাগান থেকে এসে তখন সপরিবারে আমার বাড়িতেই ছিল। তাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বললাম—যেন সে নগদ-বিদায়ে রাজী না হয় এবং চাপ দ্যায় রয়্যালটির জন্যে।

পরদিন প্রাতঃকালে কে. মল্লিক এলেন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে। কে. মল্লিক নগদবিদায়ে রাজী হবার জন্যে নানা যুক্তি দেখিয়ে নজরুলকে রাজী করাবার চেষ্টা করলেন। নজরুলের এক কথা—রয়্যালটি। কে. মল্লিক লক্ষ্মী হাউসে গিয়ে ভট্টাচার্য মশায়কে সব কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত রয়্যালটিতেই সম্মত হল গ্রামোফোন কোম্পানি। গান-রচয়িতা ছাড়া গানের সুরদাতা ও গানের শিক্ষকও নজরুল। সুরসংযোজন ও শিক্ষকতার জন্যে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ বরাদ্দ ছিল। সে অঙ্কটার কথা আমার মনে নেই।

অর্থাগমের দিক দিয়ে এই সময়টাই নজরুলের জীবনে বোধ হয় সব চেয়ে ভালো সময়। তার গানের রেকর্ড যেমন বেরোচ্ছে, বিক্রীও হচ্ছে তেমনি দ্রুতগতি। সেইরকম কাটতি তার গানের ও কবিতার বই-এরও। বই-এরও তেমনি চাহিদা।

নজরুলের সঙ্গে চুক্তি হবার আগে গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলের গানের একটি রেকর্ড বার করেছিল। নজরুলের জীবন-চরিতকাররা সকলেই সে রেকর্ডের গায়কের পরিচয় দিয়েছেন—

তিনি নাকি হরেন ঘোষ। কিন্তু হরেন ঘোষ নয়—হরেন বসু।

গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যখন রেকর্ড করার কথা হয়, সেটা বোধ হয় ১৯২৭-২৮ সাল। এ সময় নজরুলের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। আমার বাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার কনিষ্ঠ পুত্রসন্তান অনিরুদ্ধ (নিনি)।

কিছুদিন আমার বাড়ি থেকে নজরুল পরিবারবর্গ নিয়ে গেল মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। এই বাড়িতে এসে নজরুলের বিপদের পর বিপদ। নিজে আক্রান্ত হল এক উৎকট রোগে। চিকিৎসা করছেন নজরুলের বন্ধু ডাক্তার নরেন ব্রহ্মচারী। নজরুল ভাবলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বললেন, পুরো একট. কোর্স চিকিৎসার জন্য আরও কয়েকটা ইনজেকশান দিলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। নজরুল আর ইঞ্জেকশান নিতে সম্মত হল না। নজরুল ভাবলে সে বেশ সেরে উঠলো।

১৯৩০-এর বোধ হয় এপ্রিল মাস। হঠাৎ কালো মেঘ ঘনিয়ে এল নজরুলের মাথার উপরে। নজরুলের প্রিয় পুত্র বুলবুল দারুণ জ্বরে শয্যাশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সারাদেহে বসন্ত ব্যাধির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি দেখা দিল। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়লো নজরুল। রোগ নিরাময়ের জন্যে যত রকমের চিকিৎসা আছে, একে একে সবই পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল—কোন কিছুতেই ব্যাধির প্রকোপ কমে না, বরং বাড়ে। শেষ পর্যন্ত কে যেন সন্ধান দিল এক তান্ত্রিকের, যশোর রোডের উপর এক জায়গায় তিনি থাকেন। এলেন তিনি। দু'তিনদিন তাঁর চিকিৎসা চলল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলছে দিনের পর দিন। একদিন সন্ধ্যায় আমার গানের প্রোগ্রাম ছিল কলকাতা রেডিয়োতে। রেডিও স্টেশনে ব'সে আমি প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট

সময়ের অপেক্ষা করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। একজন বন্ধু বলছেন—"শিগ্‌গির চ'লে এস, বুলবুল মারা গেছে।"

মর্মান্তিক সংবাদ। তার চেয়েও মর্মান্তিক দৃশ্য নজরুলের বাড়িতে। আমাকে দেখেই অতো বড় দুর্দম বিদ্রোহী নজরুল "আমার বুলবুল উড়ে গেছে নলিনীদা" ব'লে আমার সামনে আছড়ে পড়ল। আমার স্ত্রী এসেছিলেন। তাঁর সম্মুখেও সেই একই অবস্থা, মর্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস। ওদিকে নজরুলের শাশুড়ীর বজ্রাহত মূক মূর্তি আর পুত্রশোকাতুরা মাতার অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ। সাহস ক'রে কে দেবে সান্ত্বনা? কী সে সান্ত্বনাবাক্য,—যাতে এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গার অপসৃত হবে? অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক হ'লে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন করতে লাগলেন নজরুলের বন্ধুবান্ধবরা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিনই মস্‌জিদ্‌বাড়ি স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সপরিবার নজরুল এলো আমার বাড়িতে।

বুলবুলের রোগশয্যার পাশে থেকে লেখা তার "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" গ্রন্থ তখন ছাপা হচ্ছে কালিকা প্রেসে। প্রেস থেকে প্রুফ আসছে আমার বাড়িতে। প্রুফ দেখছি আমি ও নজরুল। এই সব কাজের মধ্যে থেকে শোকের প্রকোপ অনেকটা কমলে আমার বাড়ির কাছাকাছি থাকবার জন্যে একটি বাড়ির সন্ধান করতে লাগল নজরুল। কাছেই বাড়ি পাওয়া গেল বটে কিন্তু অতি জীর্ণ পুরনো একটি বাড়ি। এই বাড়িতেই গেল নজরুল পরিবারবর্গ নিয়ে।

॥ ৮ ॥

আমার মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা গ্রামে নজরুল একবার গিয়েছিল একটি বিয়ের বরযাত্রী হয়ে। বরপক্ষ কলকাতাবাসী। নিমতিতার জমিদারবাড়ির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। সেই বিয়েতে বরকন্যা উভয় পক্ষ থেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন লালগোলা হাই স্কুলের হেড্‌মাস্টার বরদাচরণ মজুমদার। বরদাচরণ পূর্বে নিমতিতা

ছাই স্কুলেরও শিক্ষক ছিলেন। সেই সময় থেকেই আমরা জানি তিনি গৃহী যোগী। তাঁর যোগৈশ্বর্যের শক্তির পরিচয় আমি ব্যক্তিগত ভাবে পূর্বেই পেয়েছিলাম। নিমতিতায় নজরুলকে বরদাবাবুর যোগৈশ্বর্যের কথা বলি। নজরুল নিমতিতায় বরযাত্রীদের আবাসে গান গাইতো। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতো। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতো,—তাদের মধ্যে কোন কোন সময়ে বরদাবাবুও উপস্থিত থাকতেন। নজরুল বরদাবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কলকাতায় পরে জানতে পেরেছিলাম। জানি না, নজরুলের প্রতি বরদাবাবুও আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা।

বুলবুলের মৃত্যুর পর নজরুল একদিন এসে আমাকে বললে, তার মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না, সে একবার লালগোলায় গিয়ে বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডি. এম. লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদার ও তাঁর বন্ধু পূর্ণিয়ার ডাক্তার অমরেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল গেল লালগোলায়। দু'তিন দিন পরেই ফিরে এল। পাঁচ-সাত দিন পরে আমাকে সে লালগোলার আনুপূর্বিক বিবরণ বললে, "বরদাবাবুর কাছ থেকে আমি শান্তির সন্ধান পেয়েছি। তাছাড়া তাঁকে বলেছিলাম—'একবার বুলবুলের দেখা পাওয়া যায় না?' তিনি বলেছিলেন— পাবে। কিন্তু কথা বলো না তার সঙ্গে।' "

"বুলবুলের দেখা পেয়েছি নলিনীদা। কাল রাত্রে তাঁর নির্দেশমতো ধ্যান করছি, এমন সময় মনে হ'ল কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকলো। চেয়ে দেখি—বুলবুল। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার খেলনা, পুতুল, আরও যে স্মৃতিচিহ্ন একটি আলমারিতে রাখা ছিল, সেই আলমারিটি সে খুললো। তার পর ঐ আলমারির মধ্যে রাখা তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলনা, পুতুল একটি একটি করে দেখে সে আলমারি বন্ধ করে দিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে সেই আগেকার মত হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

বলতে বলতে কেঁদে ফেলল নজরুল। বললাম—"বুলবুলের দেখা পেলে তুমি শান্তি পাবে বলেছিলে, ভাই। কাঁদছ কেন?"

আমি বিবেকানন্দ রোডের উপরে একটা ভাল বাড়ি পেয়ে কিছুদিন পরে আমার জেলেটোলার বাড়ি ছেড়ে দিলাম। বাড়িটি বিবেকানন্দ রোডের উপরে হলেও ঠিকানা সীতানাথ রোড। আমার এই নতুন বাড়ির পাশেই সীতানাথ রোডের উপর একটা ভাল বাড়ি খালি হল দেখে নজরুল চলে এল এই বাড়িতে। এই বাড়িতে এসেই সে আমার বাড়িতে খুললো "বুলবুল সঙ্গীত বিদ্যালয়"।

এখন নজরুলের অবস্থা বেশ সচ্ছল। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে যথেষ্ট অর্থোপার্জন, বই-এর আয়ও নেহাৎ কম নয়। নজরুলের অনেক দিনের একটি সাধ পূর্ণ হল: একখানি ছোট মোটরগাড়ি কিনল নজরুল। পিজো কার—মনে হয় ফ্রান্সের গাড়ি। ছোট গাড়ি, চলে ভাল, তেল-খরচও কম। বেশ গেরস্তপোষা গাড়ি।

এই সময়েই সে দার্জিলিং বেড়াতে গেল। বোধ হয় সঙ্গে ছিলেন "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" গ্রন্থের প্রকাশক, কালিকা প্রেসের স্বত্বাধিকারী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। মাসখানেক পরে নজরুল ফিরে এল দার্জিলিং থেকে।

নজরুল আমার বন্ধু। বন্ধু বন্ধুকে তার মনের খবর জানায়, গোপনতম কথাটিও অসঙ্কোচে বলে। এইখানে আমার কাছে নজরুল সঙ্কোচশূন্য ছিল না। তার অপকর্মের একটি কথাও সে জানাত না আমাকে। তার তিনখানি পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব বিক্রীর কথা সে আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। জানায়নি আরও অনেক কিছু।

দার্জিলিং থেকে ফিরে এল নজরুল। লোকমুখে শুনলাম—ছোট গাড়িতে তার অসুবিধা হচ্ছে, বড় গাড়ি কিনবে। কিনলেও বিরাট গাড়ি। দেখে আনন্দই হ'ল। কিন্তু পরে শুনলাম—এ গাড়ি সে

গাড়ির কোম্পানি থেকে ধারে কিনেছে এবং সে ধার সুদ সমেত তাকে কয়েক বছরে কয়েক কিস্তিতে শোধ করতে হবে। এ ব্যবস্থায় নজরুলের মনে কোন দুশ্চিন্তা না জাগলেও আমি একটু চিন্তিত হয়েছিলাম।

আমি একবার সপরিবারে রাঁচি গেছি। আছি একটি আত্মীয়-বাড়িতে। কিছুদিন পরে দেখি, নজরুল তার সেই বিরাট গাড়ি নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে হাজির। গাড়ি থেকে নেমে সে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। আমার স্ত্রীকে বলল—"চলুন বৌদি, আপনারা সবাই চলুন আমার বাড়িতে।"

আমি বললাম—"কবে এলে তুমি? কোথায় তোমার বাড়ি?"

"এসেছি কাল। কলকাতা থেকে বাড়ি ঠিক করেই এসেছিলাম। হিনুতে বাড়ি। চল তোমরা।"

নজরুলের হিনুর বাড়িতে রইলাম দু'তিন দিন। কিছুদিন পরে কলকাতায়। তার পরে ফিরলো নজরুল।

॥ ৯ ॥

কলকাতায় ফিরে নজরুল এক কাণ্ড করে বসল। কে যে তার মাথায় দুর্বুদ্ধি দিয়ে তার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে দিল যে ব্যবসা করলে সে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতে পারবে। মহা উৎসাহে নজরুল ব্যবসায়ে নামল। বাড়ির কাছেই বিবেকানন্দ রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল একটি গ্রামোফোনের দোকান। নাম—"কলগীতি"। দৈনিক আয়ের পরিমাণ না জানলেও ব্যয়ের পরিমাণটা ফুটপাতের ওপর থেকে পথযাত্রীরা সহজেই অনুমান করতে পারত। ক্রেতারা তো বটেই, অনাহূত অভ্যাগতদেরও অনেকের হাতেই চায়ের পেয়ালা দেখা যেত। দোকানের গণেশ অচিরকাল মধ্যেই শীর্ষাসন ক'রে ঊর্ধ্বপদ অধঃশির হলেন।

বছরখানেক পরে আমি সীতানাথ রোডের বাড়ি ছেড়ে এলাম

শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে যতীন্দ্র ম্যানসনে। নজরুলও ও-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এল হরি ঘোষ স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। গ্রামোফোন কোম্পানির আর্টিস্ট ও কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ দাস তাকে এই বাড়িটির সন্ধান দিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের বাড়ির পাশেই নজরুলের বাড়িটি।

এই নতুন বাড়িতে এসে নজরুল বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। গান লিখছে। কেউ অনুরোধ করলে গান গাইছে, আবার অনুরোধে প'ড়ে কাউকে গান শেখাচ্ছেও। কোন শুভ মুহূর্তে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছে। বরদাবাবুর কাছ থেকে পাওয়া সাধনাও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। নজরুলের স্ত্রী ও শাশুড়ীও পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল—নজরুলের স্ত্রী প্রমীলার দুটি পায়ে ঝিঁঝি ধরার মতো উপসর্গ। এর আর বিরাম নেই। ক্রমে ক্রমে পা-দুটি অসাড় হ'তে হ'তে কোমর থেকে নিম্নের অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সংসারের উপর বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে দেখা দিল। যথাবিধি চিকিৎসা চলছে। বিফল চেষ্টা। অনন্যোপায় হয়ে নজরুল শরণাপন্ন হ'ল তার গুরু বরদাচরণ মজুমদারের। বরদাবাবু কলকাতায় এসে উঠলেন তাঁর অনুরাগী মল্লিকদের বাড়িতে—ভবানীপুরে, মোহিনীমোহন রোডে। দেখলেন নজরুলের স্ত্রীকে। দেখে তিনি কী বললেন নজরুলকে বা কোনরকম ক্রিয়াকর্ম করলেন কি না—কিছুই জানতে পারলাম না। কিন্তু রোগীর কোনো উন্নতির লক্ষণ নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দুশ্চিন্তায় কেটে যাচ্ছে। রোগীর চিকিৎসার জন্যে যে যা বলছে তাই করছে নজরুল।

১৯৩৮ সালে আবার এলেন বরদাবাবু। এই সময়ে আমি সুবিখ্যাত সলিসিটর অসীমকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অশোককৃষ্ণ দত্তকে বাংলা পড়াবার জন্যে কয়েক মাস শিক্ষকতা করেছিলাম। একতলায় একটি ঘরে পড়াতাম। একদিন দেখি বরদাবাবুকে সঙ্গে

নিয়ে নজরুল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। নজরুল নিজে থেকে কিছু বলেনি। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি।

একভাবে শুয়ে থেকে নজরুলের স্ত্রীর পিঠের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড 'বেড্‌সোর' দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা নাকি বলছেন— এ বেড্‌সোর সারবে না, এতেই রোগীর মৃত্যু।

নজরুল কার কাছ থেকে খবর পেল—কলকাতা থেকে ১০।১২ মাইল দূর ডায়মণ্ডহারবার রোডের কাছে কদমতলা গ্রামে কে একজন ভূতসিদ্ধ ব্যক্তি অদ্ভুত চিকিৎসা করে। স্বয়ং ভূত এসে ওষুধ ছায়। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি এই ভূতের চিকিৎসায় সেরেছে। নজরুলের ঐ গাড়িতে চড়ে আমরা তিনজনে—নজরুল, আমি আর গ্রামোফোন কোম্পানির হেম সোম গেলাম সেখানে। ভূতের ওষুধ পাওয়া গেল। ওষুধ নিয়ে আশায় বুক বেঁধে নজরুল এল কলকাতায়। পরদিন সকালবেলায় স্বয়ং ভূতসিদ্ধ সাধক নজরুলের বাড়িতে এসে উপস্থিত। রোগী দেখে তিনি ভূতের দেওয়া সেই ওষুধ বাতিল ক'রে দিয়ে ঐ বেড্‌সোর সারাবার ওষুধ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—ঐ ওষুধে পক্ষকালের মধ্যে অতো বড় বেড্‌সোর সম্পূর্ণ সেরে গেল। বিশ্বাস হ'ল লোকটির উপর। তিনি বহু চেষ্টা করলেন পক্ষাঘাত সারাবার জন্য। কিন্তু কিছুমাত্র ফল হ'ল না।

নজরুল কার কাছে যেন শুনলো—বীরভূম জেলার বেলে গ্রামে ধর্মরাজতলায় একটি পুকুর আছে, সেই পুকুরে ডুব দিলে হাতের কাছে কিছু লতাগুল্ম পাওয়া যায়। সেই লতাগুল্মের রস মাখালে বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি সারে। বীরভূম জেলার লাভপুর থেকে যেতে হয় সেই বেলে গ্রামে। লাভপুরে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তারাশঙ্করকে টেলিগ্রাম ক'রে আমরা দুজনে রওনা হলাম। এটা ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস। লাভপুরে পৌঁছলাম। তারাশঙ্কর বেলে গ্রামে যাতায়াতের জন্যে একখানা

ভাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে পৌঁছে যথাবিধি একটি নির্দিষ্ট পুকুরের পঙ্কিল জলে ডুব দিয়ে নজরুল কতকগুলো গাছগাছড়া তুলে আনলে। ওষুধ সংগ্রহ ক'রে ফিরলাম লাভপুরে। লাভপুরের পীঠস্থান "ফুল্লরা"-মন্দিরে গিয়ে রাত্রে তারাশঙ্করের বাড়িতে গানের আসরে গান গেয়ে আমরা পরদিন কলকাতায় ফিরলাম।

ঐ এঁদো পুকুরের গাছগাছড়া দিয়ে চিকিৎসা চললো কয়েকদিন। কোনও ফল হ'ল না।

॥ ১০ ॥

বাল্যকাল থেকেই নজরুলের অন্তরে একটা আধ্যাত্মিক আকূতি ছিল। বাল্যকালে লেখা লেটোর দলের "চাষ কর' দেহ-জমিতে" গানটি থেকেই তা বোঝা যায়। পরবর্তীকালে করাচির সেনানিবাসে ব'সে লেখা সত্যঘটনামূলক "মুক্তি" কবিতাটির মর্মমূলেও ঐ অধ্যাত্ম আকূতিরই বহির্বিকাশ। ১৯২০ সালে কলকাতায় এসে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সে এই বাইশ বছরে কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে—আধ্যাত্মিকতার অমৃতধারায় বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলিয়েছে। বুলবুলের মৃত্যুর পর অর্থাৎ গুরু বরদাচরণ মজুমদারের কাছ থেকে সাধননির্দেশ পাবার পর থেকে তার রচিত বাংলা ভক্তিসঙ্গীতগুলিকে ভজন ও সাধনসঙ্গীত বললে অত্যুক্তি হয় না।

এ-সময়ে নজরুলদের একটি সাধনকেন্দ্র ছিল বালিগঞ্জে মহানির্বাণ রোডে। সন্ধ্যার পর সেখানে সমবেত হতেন সাধকেরা—সাধিকাও ছিলেন একজন। নজরুল ছাড়া সেখানে যেতেন রায়সাহেব নরেন্দ্রনাথ রায়, হেমচন্দ্র সোম, বিভুপদ কীর্তি, শৈল দেবী ও আরো কয়েকজন। মাত্র একটি দিন আমি তাঁদের সেখানকার সাধন-কেন্দ্রটিতে গিয়েছিলাম। নজরুলের সাধনার কথা আমি কয়েক বছর আগে এই 'কথাসাহিত্যে'র একটি সংখ্যায় স্বতন্ত্র ভাবে সবিস্তারে লিখেছি।

এই সময়ে নজরুলের একটি নতুন পরিচয় সহসা পাওয়া গেল—সে হস্তরেখা-বিশেষজ্ঞ হয়েছে। লোকের হাতের রেখা দেখে যা বলে, তা নাকি হুবহু মিলে যায়। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। একদিন সে আমার বাড়ি এসেছে। আমার বড় মেয়ের বয়স তখন চৌদ্দ-পনেরোর বেশি নয়। মেয়ের মা ঐ সময়েই জামাই খুঁজতে ব্যস্ত হয়েছেন। মাঝে মাঝে আমাকে উত্ত্যক্ত করেন মেয়ের বিয়ের জন্যে। একদিন নজরুলকে পেয়ে মেয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে আমার স্ত্রী বললেন—"ওর হাতটা একবার দেখুন তো, কখন ওর বিয়ে হবে ?"

নজরুল নিবিষ্ট মনে মেয়ের দুটি করতলই দেখতে লাগলো। শেষে মেয়েকে বললো, "তোর বিয়ে হবে না মা। তেইশ বছর বয়সে তোর জীবনে একটা খুব ভালো পরিবর্তন আসবে।"

গিন্নী তো দ'মে গেলেন। আমি তো বিশ্বাস করতামই না। কিন্তু আট বছর পরে আমার সে মেয়ে ঠিক তেইশ বছর বয়সেই পণ্ডিচেরী এসে আশ্রমজীবন গ্রহণ করলো। সেটা ১৯৪৮ সাল। নজরুলকে তার ভবিষ্যদ্বাণীর শুভ সংবাদ জানাতে গেলেও তখন তার সেকথা বোঝবার শক্তি নেই। সে সংবিৎহারা!

নজরুলকে দেখেছি সে অবলীলাক্রমে গান লিখতো, যেন চিঠি লিখে চলেছে। স্বেচ্ছায় সে খুব কম গানই লিখেছে। নাট্যকারদের নির্দেশে নাটকের চরিত্রানুযায়ী যথাযথ স্থাপনের জন্যে গান লিখে দিয়েছে। গ্রামোফোন রেকর্ডের গানগুলো তো প্রায় সবই ফরমাইশী লেখা।

একটা বিশেষ ফরমাইশী লেখার কথা বলি: সুপ্রসিদ্ধ গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী একবার রবীন্দ্রনাথের দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন—"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা, যায় তাহা যায়" আর "সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগে না যখন প্রাণ"। অনুমোদনের জন্যে সেই গান দুটির প্রুফ রেকর্ড গ্রামোফোন

কোম্পানি বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত বিভাগে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞেরা জ্ঞানবাবুর সে রেকর্ড অনুমোদন করলেন না। ভুল সুরে নাকি গাওয়া হয়েছে। জ্ঞানবাবু সব খবর শুনে ক্ষেপে গেলেন। জোর গলায় বললেন—"ভুল সুর? দুটি গানেরই সুর আমার কাকার। কাকার কাছ থেকেই আমি গান দুটি শিখেছি। ভুল সুর আমার? ওরাই ভুল সুরে গায়।"

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কাকা, সুবিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বহুদিন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে ছিলেন। সে-সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে সুরযোজনা করেছিলেন। সেই সময়েই জ্ঞানবাবুর গাওয়া গান দুটিতেও সুর দিয়েছিলেন জ্ঞানবাবুর কাকা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

নজরুল ব'সে। জ্ঞানবাবু বললেন—"কাজি সাহেব, ঐ দুটো গানের ছকে ফেলে দুটি গান লিখে দিতে পারেন?"

বেশি অনুরোধ করতে হ'ল না নজরুলকে। নজরুল লিখে দিল ঠিক ঐ ছন্দে দুটি গান: "শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়" আর "যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম"। জ্ঞানবাবু তাঁর কাকার দেওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটির মূল সুরেই নজরুলের গান দুটি রেকর্ড করলেন।

একটি কথা বলা দরকার: ঐ রেকর্ড করা গান দুটির মধ্যে "শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়" গানটি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা—নজরুল নাকি তার ছেলে বুলবুলের মৃত্যু উপলক্ষে গানটি লিখেছিল। উপলক্ষের কথা তো আগেই বলেছি। হয়তো গানটি রচনার সময় বুলবুলের কথা তার মনে জেগে থাকতেও পারে। গানটি কিন্তু বুলবুলের মৃত্যুর অনেক পরের লেখা।

॥ ১১ ॥

ঘরে চলচ্ছক্তিহীন অসুস্থ স্ত্রী। সংসারের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নজরুল গ্রামোফোন রেকর্ডের গান

রচনা, রেডিয়ো অফিসে গিয়ে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সোহচর্যে "হারামণি" ও "নবরাগমালিকা"র অনুষ্ঠানের জন্যে গান লেখা প্রভৃতি অব্যাহত গতিতে করে চলেছে। এ ছাড়া তার সন্ধ্যাকালের ধ্যানধারণা নিত্যকর্ম আছেই।

১৯৪০ সাল। আমার নিজের পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্যে এ-সময় নজরুলের সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হ'ত। যা-কিছু দেখাশোনা হ'ত রেডিয়ো আপিসে। আমি তখন বেতার জগতের সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তার বেশি ঘনিষ্ঠতা। সুরেশের কাছ থেকে নজরুলের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অনেক কথা জানতে পারতাম।

একদিন একজনের কাছ থেকে অনেকগুলি দুঃসংবাদ পেলাম। দেনার দায়ে নজরুল জর্জর। পর পর কয়েকটা কিস্তির টাকা দিতে না পারায় তার গাড়িটি গেছে। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে পাওনা রয়্যালটির সমস্ত আয়, প্রকাশিত বইগুলি থেকে সম্ভাব্য প্রাপ্য—সব কিছু বন্ধক রেখে সে সলিসিটর অসীমকৃষ্ণ দত্তের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে সব দেনা শোধ করেছে। নজরুল নিঃস্ব।

নজরুলের এই দুর্দিনে পরিত্রাতা রূপে এগিয়ে এলেন তার বন্ধু কালিপদ গুহরায়। এককালে দৈনিক 'নবযুগে' কালিপদ গুহরায় ছিলেন সম্পাদক নজরুল ইসলামের সহকারী। সেই সময়েই দুজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তখন কালিপদ গুহরায় ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ ছাড়া ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে কালিবাবুর একটি বিশেষ পরিচয় ছিল: তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন গৃহীযোগী। যোগৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ সাধক।

১৯৪১ সালেও রেডিয়ো আপিসে নজরুলের নিয়মিত যাতায়াত অব্যাহত আছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের কবিতা "রবিহারা" সে রেডিয়ো অফিসে ব'সেই লিখলো। আবৃত্তি করলো রেডিয়োতে। বেতার জগতে আমি প্রকাশ করলাম কবিতাটি। ভালোই আছে নজরুল।

১৯৪২-এর গোড়ার দিকে একদিন নজরুলের বাড়ি গেছি। নজরুলের শাশুড়ী বললেন—"সে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল-বাড়িতে।" সেখানে গিয়ে তার ঘরে ঢুকতেই—"এসো এসো" ব'লে বললে—"খুব ভালো ক'রেছো এসে। ক'দিন ধরেই তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি, কিন্তু একলা পাচ্ছি না তোমাকে। শোনো বলি: তুমি এতদিন যোগসাধনা করছো, কোন্ স্তরে তুমি উঠেছো, জানো?"

বললাম—"না ভাই, ও-সব জানি না।"

"আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি দেখেছি—তুমি সচ্চিদানন্দ স্তরে উঠেছ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হতে পারোনি। বোস, তোমাকে আমি সচ্চিদানন্দ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। তুমি আমার কপালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাক।"

এই কথা বলে দু'তিন মিনিট চোখ বুজে প্রাণায়ামের মতো শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া করে চোখ খুলে বললে—"তোমাকে আমি সচ্চিদানন্দ করে প্রতিষ্ঠিত করে দিলাম।"

ভাবলাম, এ কী হল নজরুলের? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

রেডিয়ো অফিসে গিয়ে বন্ধুবর সুরেশ চক্রবর্তীকে সব কথা বললাম—"নজরুল পাগল হয়ে গেল নাকি?"

এর পর বেশি দিন গেল না। নজরুলের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই খবর শুনে সজনীকান্ত দাস নজরুলকে একখানি চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, সে কেমন আছে। নজরুল চিঠির জবাব দিল দু'লাইন কবিতা লিখে:

"ভালোই আমি ছিলাম এবং ভালোই আমি আছি—
হৃদয়-পদ্মে মধু পেল মনের মৌমাছি।"

সজনীকান্ত ঐ কবিতা দেখিয়ে সকলকে বললেন—"কে বলো, নজরুল পাগল হয়েছে?"

এই অবস্থায় একদিন দুপুরের পর নজরুল নিরুদ্দেশ। কখন সে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, কেউ জানে না। শ্যামপুকুর থানা থেকে এই দুঃসংবাদ শহর ও শহরতলীর সব থানায়

টেলিফোন ক'রে জানানো হ'ল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কলকাতা থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্তী পানিহাটি থানা থেকে শ্যামপুকুর থানায় খবর এল—"কাজি নজরুল ইসলামকে পাওয়া গেছে।"

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ-কালীন সমরসম্ভার-ভরতি ট্রাঙ্ক, সৈন্যবাহিনীপূর্ণ লরি-গাড়ি। সেই চলন্ত গাড়ির ভিড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে চলেছে নজরুল। পথচারীদের একজন চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কাজি সাহেব, কোথায় চলেছেন?"

"পণ্ডিচেরি যাচ্ছি।"

উত্তর শুনেই প্রশ্নকর্তা বুঝতে পারলেন—নজরুলের কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নজরুলকে নিয়ে এলেন নিকটবর্তী পানিহাটি থানায়।

এর পর অবস্থা দিন দিন অবনতির পথেই অগ্রসর হয়ে চললো। ক্রমে স্তব্ধবাক্‌।

এ-দেশে ও বিদেশে নজরুলের চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল। সব চেষ্টাই বিফল। কেউ কেউ বললে—যোগসাধনার ফলে এই রোগের আক্রমণ। বিদেশের ডাক্তারেরা পরীক্ষা ক'রে বললেন—কোনও কারণে মস্তিষ্কের একটা অংশ শুকিয়ে গেছে। অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে, কিন্তু বাঁচবার আশা কম।

[illegible]ণ্ডিচেরি থেকে কলকাতায় গেলে নজরুলকে দেখতে যেতাম। দে[illegible] দুঃখ হত। শূন্য ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে থা[illegible]তো। বাক্‌শক্তিহীন। বোঝা যেতো না সে আমাকে চিনতে [illegible]রেছে কি না।

মাত্র একটিবার মনে হয়েছিল সে হয়তো চিনতে পেরেছে [illegible]মাকে। কলকাতায় গিয়ে একবার তার ক্রিস্টোফার রোডের [illegible]ড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটি ফরাস-পাতা তক্তা-পোশের উপর নজরুল ব'সে। তক্তাপোশের এক কোণে একটি

হারমোনিয়াম। আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম। একবার আমার দিকে চাঁইলে। কোনো ভাবান্তর নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের কয়েকজন ছাত্রী এলেন নজরুলকে দেখতে। তাঁরা আমাদের সম্মুখে মেঝের উপরেই ব'সে পড়লেন।

নজরুল হারমোনিয়ামের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে বললো—"গাও, গাও।" অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

তারই লেখা অনেকগুলি গান গাইলাম। প্রত্যেকটি গানে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো নজরুলের চোখে-মুখে। কে জানে, সেদিন আমাকে চিনতে পেরেছিল কি না!

চিনতে পারুক আর নাই পারুক, আমার বন্ধুকে আমি সেদিন আনন্দ দিতে পেরেছিলাম ব'লে আমি আনন্দিত।

কিন্তু সে আনন্দও ফুরিয়ে গেছে। নজরুল নেই।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার